সমুদ্র গুপ্ত

দে'জ পাবলিশিং : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর-১৯৬০

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ ঃ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক ঃ
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

এই বইয়ের মানুষগুলি বড়। রুদ্রপ্রাণ। ঘটনাগুলি ছোট। ক্ষুদ্রপট। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পটেই ছায়া ফেলেছে তাঁদের সমগ্র জীবনের তেজোদীপ্ত মহিমা। এতে তত্ত্বকথা নেই। যে সব স্মরণীয় মানুষকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি, ভুলতে চাইছি, ভুলে দেশের ভালো হবে ভাবছি, তাঁদের ভাস্বর জীবনের কিছু খণ্ড চিত্রকে সাধারণের কাছে সরল ও সরস করে তুলে ধরা কেবল। এর অধিকাংশ লেখা বেরিয়েছিল আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে। কিছু নতুন লেখা যোগ হয়েছে বই হয়ে ওঠার তাগিদে।

বইটি উৎসর্গ করলাম শঙ্করী প্রসাদ বসুকে, মাত্র এক দিনের কিছুক্ষণের আলাপের উজ্জ্বল স্মৃতিকে মনে রেখে। আপাতঙ্খ্যাতির অন্তরালে থেকে তিনি প্রায় তপস্যার মত যে বৃহৎ কাজে ব্রতী, তারই প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হোল, বারীন্দ্র কুমার ঘোষের আমার আত্মকথা, অরবিন্দের কারাকাহিনী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাসিতের আত্মকথা, গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরীর শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ, ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের দেশবন্ধু স্মৃতি, সূর্যকুমার ঘোষালের কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও শরৎ কুমার রায়ের অশ্বিনী কুমারের দুটি জীবনী, বিমান বিহারী মজুমদারের MILITANT NATIONALISM IN INDIA, সরলা দেবীর জীবনের ঝরাপাতা, শঙ্করী প্রসাদ বসু প্রমুখ সম্পাদিত বিশ্ব বিবেক, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস এবং এছাড়া আরও কিছু ইংরেজী ও বাংলা পত্র পত্রিকা।

অমৃতের পুত্রেরা ও বিবেকানন্দ

১৯০২। ৫ই জুলাই। নিবেদিতা তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে। সবে ভোর। সবে গত রাতের ধ্যান-মগ্ন ঘুমের থেকে জাগা। সেই মুহূর্তে দরজায় ঘা। দ্বারে দাঁড়িয়ে এক সংবাদবাহক। হাতে স্বামী সারদানন্দের লেখা চিঠি।

প্রিয় নিবেদিতা, সব শেষ হয়ে গেছে। গত রাত নটায় স্বামিজী মগ্ন হয়েছেন চিরনিদ্রায়। আর জাগবেন না।

নিবেদিতা ছুটলেন বেলুড়ে। মর্মে মর্মান্তিক বিষাদ। কিন্তু বাইরে শোকের কোন চঞ্চলতা নেই।

ওদিকে তখন মন্ত্রপাঠ। ধূপ দীপের আরতি। শোকের শঙ্খধ্বনি। অগণিত জনতার শেষ নতজানু প্রণাম। শেষ অশ্রু নিবেদন। তারপর চিতাশয্যা! চিতায় আগুন।

নিবেদিতা বসে আছেন সারাক্ষণ সারাদিন এক বিল্ববৃক্ষের নীচে। নিবাত-নিষ্কম্প এক দীপশিখা। চিতা ভস্মীভূত। চিতা-ভস্ম বাতাসে উড়ছে। তার মধ্যে থেকে স্বামিজীর দেহাচ্ছাদনের রেশমী গেরুয়ার একটা টুকরো এসে উড়ে পড়ল নিবেদিতার কোলে। সেই রাতে মঠের প্রার্থনা সভার শেষে নিবেদিতার আত্মসমাহিত কণ্ঠে সহসা শোনা গেল এক অদ্ভুত স্বগতোক্তি—'স্বামিজী আমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন। আমাকে করতে হবে সেই কাজ।' নিবেদিতার জীবনে এক নতুন পর্বের শুরু হল মুহূর্ত থেকে। যেন এক নতুন ব্রতের উদ্বোধনী-রজনী সেই রাত।

হাওড়া স্টেশন। বোলপুর থেকে ফিরছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। হাওড়া স্টেশনে পা দিয়েই শুনলেন, সব শেষ। স্বামিজী আর নেই। তখুনি ছুটলেন বেলুড়ের পথে। যেন এক নিভন্ত মশাল ছুটে চলেছে মহাসূর্যের দিকে, অগ্নি-অন্বেষণে।

চিতা তখন বহ্নিমান, ব্রহ্মবান্ধব এসে দাঁড়ালেন চিতার পাশে। তখন তাঁর বুকের ভিতরেও জ্বলতে শুরু করেছে অন্য এক সুবৃহৎ সংকল্পের অগ্নিশিখা। তখন তাঁর কানে বাজছে এক প্রেরণাময় দৈববাণী। কে যেন তাঁকে জানালে—"তুমি তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গী জয় ব্রত গ্রহণ কর।"

উপাধ্যায় সেই মুহূর্তে স্থির করলেন যাবেন বিলেতে। সেখানে গিয়ে প্রচার করবেন হিন্দু-দর্শনের পরম বাণী। উপাধ্যায়ের জীবনেও এক নতুন পর্বের শুরু সেই মুহূর্তে। নতুন ব্রতের উদ্বোধন-দিবস যেন সেই দিন।

বিবেকানন্দ-প্রয়াণের পর কেটেছে মাত্র দু সপ্তাহ। ১৯ জুলাই। নিবেদিতা বেলুড় মঠের সঙ্গে ছিন্ন করলেন নীতির বাঁধন। আজ থেকে তিনি স্বাধীন। তাঁর কাজ, তাঁর কথা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের

মতবাদের নিয়ম-মানা নয়। তারপরই বাংলাদেশের হৃদয় হতে বেরিয়ে এল এক অপরূপা জননী, যাঁর ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতে শঙ্কাহরণ বরাভয়, ললাট নেত্রে অগ্নিশিখা।

তারপর তাঁর ক্রমাগত ভারত-পর্যটন।

ক্রমাগত অগ্নিময়, উদ্দীপক বক্তৃতা।

তিনিই একদা ঘোষণা করলেন—"স্বামিজীই আমাদের মহান জাতীয় নেতা।"

"What was the idea that caught Vivekananda? He saw before him a great Indian nationality, young, vigorous, fully the equal of any nationality on the face of the earth."

তাঁর পর্যটন-পথে কিছুকালের সঙ্গী ছিলেন প্রখ্যাত জাপানি শিল্পী ওকাকুরা। নিবেদিতার বুকের আগুন তাঁর নজরে এসেছিল। তিনিও দেসবাসীকে জানালেন—"যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়েছে, তবুও তিনি তোমাদের পরিচালনার জন্যে রেখে গেছেন তাঁর আত্মিক কন্যা নিবেদিতাকে। তাঁর কথা শোন।"

তাঁর চারিদিকে সংঘবদ্ধ হও।"

ঘুরতে ঘুরতে বরোদা। অরবিন্দের সঙ্গে আলাপ।

আলাপের প্রথম দিনেই প্রথম কথা নিবেদিতার।

'কলকাতা আপনাকে চায়।'

অরবিন্দের উত্তর—না, আমি অন্তরালেই থাকি।

অন্তরালে থেকে অরবিন্দ রাজনীতি এবং গুপ্ত সমিতির বিষয়ে কী ভাবছেন নিবেদিতার সঙ্গে তা নিয়ে চলল দীর্ঘ আলোচনা ও আলাপ। এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। অরবিন্দ জানালেন, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন সরলাদেবীর সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়তে। কলকাতায় ফিরেই যতীন্দ্রনাথের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ

করলেন নিবেদিতা। ইতিমধ্যে বরোদা থেকে বারীন্দ্রও এসে যোগ দিয়েছে গুপ্ত সমিতিতে। নিবেদিতা সমিতিকে উপহার দিলেন প্রচুর বই। বারীন্দ্রর নিজের কথায়—"সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক, দেড়শ বই দিয়েছিলেন।" নিবেদিতা একদিন প্রশ্ন করেছিলেন বারীন্দ্রকে—"তুমি কি তোমার দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছ?"

বারীন্দ্রের বীরোচিত উত্তর—"আপনি যদি জোয়ান অব আর্ক হন, তবে আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে অনুসরণ করব।"

ডন সোসাইটীতে তখন নিয়মিত আসা যাওয়া নিবেদিতার। প্রায়ই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার ও আলোচনার আসর বসে সেখানে। জ্ঞানীগুণীদের রত্ন-সভা। একদিন নিবেদিতা উঠেছেন বক্তৃতা দিতে। বিষয় গীতা। গীতার ব্যাখ্যার মাঝখানে হঠাৎ ঝলসে উঠল একটা ক্ষুরধার প্রশ্নের বিদ্যুৎ-রেখা। "কবে আমাদের দেশে আবির্ভূত হবেন সেই যোদ্ধা, যাঁর এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার?"

নিবেদিতার এই ব্যাকুল প্রশ্ন উত্তর পেয়েছিল পরবর্তীকালের গুপ্ত-সমিতির আন্দোলনের মধ্যে। ঐ সমিতির সদস্যদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হতো একহাতে গীতা আর একহাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে। গুপ্ত সমিতি যখন গড়ে ওঠেনি, যখন তা শুধু অরবিন্দের বিপ্লব-চেতনার গভীরে সুপ্ত বীজ মাত্র, তাকে বজ্র হয়ে উঠার আহ্বান জানিয়েছিল যারা তাঁদের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের তেজস্বী কণ্ঠস্বর অরবিন্দের কানে এসে পৌঁছত, প্লানচেটের মাধ্যমে। তারপর গুপ্ত সমিতি। যুগান্তর। বন্দেমাতরম। তারপর মানিকতলায় বোমার কারখানা। আলিপুরের মামলা। অরবিন্দ ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছেন জাতির জীবনের, চেতনার,

সংগ্রামের গভীরে। দুর্জয় সারথি। নীরদবরণের বই 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা'-য় আমরা পাই অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের অনেক স্মৃতিচিত্র, যেখানে তাঁর কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বারে বারে বিবেকানন্দের নাম।

"বাংলার আন্দোলনের কথা ভাব; সমস্ত জাতি যেমন অল্প সময়ের মাঝে জেগে উঠল; যারা ছিল অত্যন্ত ভীরু; রিভলভার দেখলে যারা কাঁপত, তাঁরা দেখতে দেখতে এমন বদলে গেল যে, পুলিশ সাহেবরা বলত—সেই উদ্ধত বরিশাল-দৃষ্টি! জাতির আত্মাই উঠেছিল জেগে এবং দেখা দিয়েছিল চমৎকার কতগুলি মানুষ। ....শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে। আন্দোলন তার গুপ্তদলসহ এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন অন্য যে-কোন দেশে সেটা ফরাসী বিদ্রোহের রূপ নিত।....কারাগারের পনের দিন তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। ....হঠযোগ অভ্যাস করার সময়ে আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবর্তীকালে এ ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।....বিবেকানন্দের কাজ হিসেবেই তিনি (নিবেদিতা) রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইই শ্রেষ্ঠ। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বিপ্লবের প্রকোপে পড়তে একবার একটা vision দেখেন, অনেকটা মানিকতলা বাগানের সাথে তার মিল আছে।

বোমার মামলায় হোক, খুনের মামলায় হোক, বিদ্রোহ-বিপ্লবের অপরাধে যাঁরই হাতে হাতকড়া পরানো হয়, দেখা যায় তাঁর ঘরে রয়েছে তিনখানি বই। এর মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। সিডিশন কমিটি উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁদের রিপোর্ট—'For their own initiates the conspirators devised a remarkable series of text

books. The Bhagavat Gita, the writtings of Viveka nanda, the lives of Mazzini and Garibaldi were part of the course".

তুমি কি বৈদান্তিক ?

হ্যাঁ।

তুমি কি বিবেকানন্দের ভক্ত ?

নিশ্চয়ই।

প্রশ্নকর্তা গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে। তিনি এসেছেন ঢাকা সেলুলার জেলে রাজবন্দীর সঙ্গে কথা বলতে। উত্তরদাতা বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী। যুগান্তর দলের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য। জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের যোগে গড়ে ওঠা Indian Independence League-এর বাংলা সম্পাদক। সুভাষচন্দ্রের সহযোগী। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বাল্যবন্ধু। অগ্নিযুগে 'হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স' নামক সেই অর্ডার সাপ্লাই আপিসের মালিক, যেখানে আসল কাজ হোত বাইরে থেকে বিদেশ থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করা। তাঁর সহকর্মী যাদুগোপাল নিজের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিতে হরি-কুমারের ছবি এঁকেছেন এই বলে--

"হরিদার অন্তঃকরণের তুলনা দেখি না। তাঁর কাছে কিছু ছোট ছিল না। কারণ তিনি নিজে সব দিক দিয়ে বড় ছিলেন। হৃদয়ে বড়, দুঃখভোগে বড়, পরদুঃখকাতরতায় বড়, সেবাধর্মে বড়, আত্ম-ভোলার পরীক্ষায় বড়, দারিদ্রের কশাঘাতকে অগ্রাহ্য ও তাচ্ছিল্য করায় বড়।"

তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হরিকুমার যে বিবরণ ও বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তাতে শুধু তিনি একা নন, এক অগ্নিবর্ণ যুগও যেন উদ্ভাসিত।

"বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামিজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা

ছাড়া বিপ্লব-আন্দোলন ঐ ভাবে হোত কিনা সন্দেহ।....বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলন ব্যাপারটা কি? কতকগুলো ছেলে ঠিক করল, মরতে হবে। নিজেরা মরে যদি অপরকে বাঁচতে শেখানো যায়! তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাই মরণের আগুনে। বিবেকানন্দ তাঁদের টেনে ঘরের বাইরে করে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কথাগুলো জ্বলছিল আগুনের মত। আমরা তাঁর কথা জপ করতুম আর কাজ করতুম। আমরা গাইতুম, 'আমরা জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'। আর বলতুম স্বামিজীর কথা—'বলি চাই'।

১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে আমার জন্ম। কোদালিয়া গ্রামে আমরা তিনজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম—নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন রায়), শৈলেশ্বর বসু এবং আমি। তিনজন অভেদাত্মা। একটা কিছু করতে হবে বলে ছটফট করছি। সে ১৯০৬ সালের মত সময়। রামদাস বাবাজীর সঙ্গে সেই সময় আমাদের পরিচয় হল। তিনি আমাদের সন্ন্যাসী করতে চাইলেন। আমরা দ্বিধায় দুলছি। এমন সময় শৈলেশ্বরের কাকা কেদারনাথবাবু আমাদের স্বামিজীর বই এনে দিলেন। তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। প্রথম হাতে পড়ল স্বামিজীর 'কর্মযোগ'। চোখে পড়ল লেখা আছে—'It is better to be attached than to be unattched.' একি কথা! সন্ন্যাসী বলছেন অ্যাটাচমেণ্টের কথা! সারা রাত 'কর্মযোগ' পড়লুম—উত্তেজিত হয়ে উঠলুম এমনই যে—রাত্রে ঘুম হল না। কিছুদিন পরে স্বামিজীর 'বর্তমান ভারত' পেলুম। এবার আমাদের জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল। স্বামিজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয়।....স্বামিজীর প্রভাব আমাদের মনে নানা ভাবে কাজ করেছিল। স্বামিজী অনেককে শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; আমাদের মত অল্পসংখ্যককে তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী করেছিলেন। স্বামিজীর বেদান্ত অনুযায়ী আমি একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ করেছিলুম। অনুশীলন সমিতিতে রক্তের

অক্ষরে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। আমি অস্বীকার করলুম যখন সতীশ বসু তাই করতে বললেন। আমি বললুম, আমার মুখের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে আর রক্ত দিয়ে লেখা কথা কটা সত্য হবে ? তার জন্য আমাকে চারদিন অবরুদ্ধ থাকতে হয়। পরে এই পদ্ধতি উঠে যায়। আমি বিবেকানন্দের বেদান্তের মানব মহিমার কথা স্মরণ করেই কথাটা বলেছিলুম।...."

আর এক মৃত্যুহীন বিপ্লবের কণ্ঠে এই একই অনুভূতির, প্রেরণার ও প্রতিজ্ঞার অনুকরণ। ইনি বাংলার চিরজীবী নেতা সুভাষচন্দ্র।

"এই সময় থেকে (বিদ্যালয় জীবনের শেষের দিকে) আমার মনের মধ্যে এক বিষম ওলট-পালট সুরু হল। প্রায় বছর ছয়েক যে কী অসহ্য মানসিক অশান্তিতে কেটেছিল, তা বলবার নয়।....আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয়, অনেক দিক দিয়ে অকালপক্কও ছিলাম। এবং ফলে যে বয়সে আমার মাঠে সময় কাটাবার সময়, সে বয়সে আমি বসে বসে গুরুগম্ভীর নানা রকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতাম।....হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি। হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম, এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল।....মানব জাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখে গেছেন—'মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী। দেশের এমন কোন আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনকে সাড়া জাগায় নি।' তিনি বলতেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, একে একে সকলেরই দিন

গিয়েছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের—এতদিন পর্যন্ত সমাজে যারা শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে। তিনি আরো বলতেন, উপনিষদের বাণী হল 'ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—চাই শক্তি, নইলে সব বৃথা। আর চাই নচিকেতার মত আত্মবিশ্বাস। অলস প্রকৃতির সন্ন্যাসীদের তিনি বলতেন, 'মুক্তি আসবে ফুটবলের মধ্য দিয়ে, গীতা পাঠ করে নয়।' বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স পনেরোও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল।....তাঁর মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।"

১৯০১। ঢাকা। স্বামিজী এসেছেন সফরে। তার মুখের কথা শুনতে শহরের যেখানে যত প্রাণবন্ত যুবক সবাই এক ঠাঁই। তাদের মধ্যে রয়েছেন হেমচন্দ্র ঘোষ। পরে যিনি ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী। রয়েছেন শ্রীশ পাল। এই শ্রীশ পাল ১৯০৮-এ হত্যা করেছিলেন সাব-ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীকে, প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার অপরাধে। স্বামিজী সেদিনকার সমবেত যুবকদের সম্বোধন করলেন কি বলে? তরুণ নয়, যুবক নয়, নবীন নয়। বললেন 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। অমৃতেরই পুত্র, কারণ এরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। মরে এঁরা কি করবে? একটা মরা দেশকে বাঁচার স্পন্দন জোগাবে। তাতেই জন্মাবে নতুন মানুষ, নতুন যোদ্ধা, নতুন প্রেমিক, নতুন সৈনিক।

তিনিও যে অমৃতের পুত্র। তাঁর মূলমন্ত্রও যে তাই। 'Man making is my misson.' এমন কি তিনি সোসালিস্ট হতেও রাজী, যদি জোটে আধখানা রুটি সব মানুষের মুখে। রাজী বোমাতেও, যদি ত্বরান্বিত হয় মুক্তি, জাগে ঘুমন্ত প্রাণ।

প্রচণ্ড বেদনায়, বিক্ষোভে, অন্তরের অসহনীয় যন্ত্রণায়, একটা মুমূর্ষু জাতির দিকে তাকিয়ে এই সব বিস্ফোরক-বাণীগুলি তাঁরই কণ্ঠের—

"What India needs today is bomb."

"I am a socialist not because I think it is a perfcet system, but half a loaf is better than no bread."

"Salvation will come through football and not through Gita."

আধুনিক ভারতের প্রথম গণ-জাগরণের, প্রথম জাতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার তিনিই প্রথম পরম প্রেরণা। আত্মদানে রক্তদানে এগিয়ে আসা একটা যুগের তিনিই স্বপ্নের উৎস, সংকল্পের উৎসাহ, রক্তের আগুন, ও অস্থি-র বজ্র।

শালগ্রামশিলা ও সুরেন্দ্রনাথ

যাঁদের হাতে ছিল কলম, বুকে বেদনা, মনে শ্রদ্ধা তাঁরা লিখতে বসে গেলেন কবিতা। সেই কবিদের মধ্যে একজন শ্রীশ্‌চন্দ্র মজুমদার। লিখলেন—

স্বদেশীর তরে বাস কারাগারে
প্রত্যক্ষ স্বরগে তুমি
হয়েছ অমর, তোমার পুণ্যেতে
পবিত্র জন্মভূমি!

'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আজীবন সুরেন্দ্র-সহচর। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তিনি ছেপে বের করলেন একটা ছোট্ট প্রহসন। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ছাপলেন একটা ছোট্ট কবিতার বই। নাম 'সুরেন্দ্র বিজয়।'

কি দুঃখের দিন আজি ভারতে উদয়,
হাহাকার রব শুধু শুনি দেশময়।
নরনারী বালবৃদ্ধ ভারতের লোক
সুরেন্দ্রের কারাবাসে করিতেছে শোক !
....

ওহে শালগ্রামশীলা দেব নারায়ণ !
তব মানরক্ষা তরে এই দুর্ঘটন !
হায় কিবা বিচারক ! কি বুদ্ধি সরস !
তোমার আকার দেখে বুঝিবে বয়স !
বলে হোক, ছলে হোক, বিবাদীর মতে
হিন্দুর আরাধ্য শিলা আনে আদালতে
এই গুরুতর কথা করি আন্দোলন
হায় রে পড়িল বাঁধা সুরেন্দ্র রতন
....

একতায় বদ্ধ সবে সুরেন্দ্রের লাগি
তাঁর দুঃখে সব যেন সমদুখভাগী।
করিতেছে মহাসভা নগরে নগরে
দেখাতেছে শোকচিহ্ন প্রতি ঘরে ঘরে।

যাঁদের বুকে বেদনা, মনে শ্রদ্ধা, হাতে কলম কিন্তু তা কবিতা লেখার নয়, কেরানীগিরির, তাঁরা কি করবেন? তাঁরা কি করেছিলেন, তার বিবরণ বেরিয়েছিল সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৯২০ সালের সেদিনটা ছিল ২৫শে বৈশাখ।

"আফিসে এই দুঃসংবাদ যাইবামাত্র কেরানীরা কলম ফেলিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই তেজোময় প্রতীভাদীপ্ত মুখখানি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরবে তাঁহার বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সার্বজনীক শোক কখনও দেখা যায়

নাই ; এমন বিপদের অন্ধকার আমোদোন্মত্ত অলস বাঙালীর হৃদয় কখনও আচ্ছন্ন করে নাই। সান্ধ্য-সমীরণে সেই শোকলহরী দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল এবং রজনীর প্রগাঢ় শান্তিতেও সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশীয়গণের শোকভারগ্রস্ত হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। কত যুবক দেবদেবীর নিকট তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।"

যাঁদের মনে শ্রদ্ধা, বুকে বেদনা, হাতে কোন কলম নেই, কিন্তু হাতের মুঠোয় রয়েছে তীব্র ক্রোধ, তাঁরা গড়লেন সভা।

গোড়ায় ভাবা হয়েছিল সভাস্থল হবে টাউন হল। পরে স্থান বদল ঘটল। ইংরেজ পাড়ায় নয়, বাঙালীর নিজস্ব এলাকাতেই ঘোষিত হবে বাঙালীর অন্তঃস্থলের অসহ্য বিক্ষোভ। স্থান নির্বাচিত হল বিডন স্কোয়ার। মাত্র দু দিন আগে বিলি করা হয়েছিল ইস্তাহার। উদ্যোক্তরা ভেবেছিলেন ৩/৪ হাজারের বেশী লোক হবে না কিছুতেই। কিন্তু সভা শুরু হতে না হতেই দেখা গেল জনসমুদ্রের শেষ নেই। কলকাতার ট্রাম কোম্পানী অদ্ভুত সহযোগিতা করেছিল সেদিনের সমাবেশকে সফল করতে। চীৎপুর অঞ্চলে, একটা দুটো নয়, পর পর প্রায় কুড়িটা ট্রাম তারা সাজিয়ে রেখেছিল প্রতিবাদী জনতার বাহন হবার জন্যে। দেখতে দেখতে তিন-চারের জায়গায় জনসংখ্যা দাঁড়াল পনেরো, পনেরো পেরিয়ে কুড়ি হাজার। তখন স্থির হল একটা সভাকে ভেঙে করা হবে তিন টুকরো। তাই করা হল।

প্রথমে ভর্তি হয়ে গেল বেঙ্গল থিয়েটার। তারপর সেদিনের কলকাতার সবচেয়ে বড় রঙ্গালয় স্টার থিয়েটার। তারপর ন্যাশনাল থিয়েটার। অগণিত জনতা। তবু শৃঙ্খলাভঙ্গের নজীর নেই কোথাও। কোথাও নেই পুলিশের সামান্যতম হস্তক্ষেপ। জনতা নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রক।

জনতার মধ্যে ছিল না শুধু বাঙালী। ছিল মুসলমান, রাজপুত, পাঠান, শিখ সর্ব জাতিধর্মের মানুষ। ছিল হিন্দু পণ্ডিত, মুসলমান

মৌলবী। বিভিন্ন সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত দীনবন্ধু বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, লালমোহন ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রাজকুমার ন্যায়রত্ন প্রমুখ। স্টার থিয়েটারের সভায় সভাপতির আসনে বসেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

'ইংলিসম্যানে' পরের দিন খবর বেরুল—"দেয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গল ইউরোপীয়ান পুলিশম্যান অ্যাণ্ড উই আর ইন্‌ফরম্‌ড দ্যাট এভরিথিং পাস্‌ড অফ কোয়ায়েটলি········।

'স্টেটসম্যান' লিখলে—"ইট ইজ্‌ অলমোস্ট ইমপসিবল টু ডেসক্রাইব দি ম্যানার ইন হুইচ ইচ অব দি এব্যভ স্পিকার্স ক্যারেড হিজ অডিয়েন্স উইথ হিম····।

'ইণ্ডিয়ান মিরর' লিখলে—"দি ইমেন্স গ্যাদারিং হুইচ ফিল্ড দি থ্রি থিয়েটার্স অ্যাণ্ড ওভারফ্লোড ইন টু দি স্ট্রীটস, ক্যান্‌নট বি এসটিমেটেড অ্যাট লিস্ট দ্যান টুয়েন্টি থাউস্যাণ্ড·······।

মায়েরা সেদিন ছেলেকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বললে—

'সুরেন্দ্রনাথের মত হও।'

মেয়েরা আশীর্বাদ পেলে মায়ের কাছ থেকে—

'বাছা, তুমি সুরেন্দ্রের মত পতিলাভ কর।'

অন্তঃপুরবাসিনী বৌ-ঝিয়েরা সেদিন সান্ত্বনা সমবেদনার চিঠি লিখে পাঠালে সুরেন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর কাছে। কলকাতার কাগজ 'রেইস অ্যাণ্ড রায়ত'। বোম্বয়ের কাগজ 'ইন্দুপ্রকাশ'। দেখা গেল দুই কাগজেরই চারপাশে পড়েছে কালো রেখার শোকচিহ্ন। শোকাভিভূত শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতবর্ষ।

যাঁদের বুকে বেদনা, মনে শ্রদ্ধা, হাতের কলমে কবিতা ফোটে না, গলায় ফোটে না বক্তৃতার ভাষা, সেই সব ছাত্রের দল সেদিন গলায় তুলে নিলে বিক্ষোভ প্রকাশের চীৎকার আর হাতে তুলে নিলে ইটের টুকরো। আদালতের গায়ে ছুঁড়ে মারবে তাদের প্রতিবাদ। সুরেন্দ্র-জীবনীকারের বর্ণনায়—

"অবিলম্বে সুরেন্দ্র-কারাদণ্ড সাধারণে বিঘোষিত হইল। ছাত্র-সম্প্রদায় কিছু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। হাইকোর্টের আশেপাশে পাঁচ সাত হাজার লোকের সমাগম। সে অবস্থায় পুলিশ গোলমাল থামাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের দু-পাঁচটা শার্সি যে না ভাঙিয়াছিল তাহা নহে। তিনজন বালক সেই হিড়িকে পড়িয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি প্রেসিডেন্সী ইনস্টিটিউশনের একজন ছাত্রের সপ্তাহকাল কারাবাস ঘটে। সেদিন পথেঘাটে, হাটে-বাজারে, রেলে, স্টীমারে, আফিসে, প্রাসাদে সর্বত্রই সুরেন্দ্রনাথের কথা।"

কঠোর নিষেধ ছিল অধ্যক্ষের। তবু প্রেসিডেন্সীর ছাত্ররা ছুটে এসেছিল আদালত প্রাঙ্গণে। সেদিনের সেই উত্তেজিত ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতা পুরুষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বেধেছিল সংঘর্ষ।

প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ—

"হাইকোর্ট ও ইডেন গার্ডেনের মধ্যস্থিত ঝাউগাছগুলির ডাল ভাঙিয়া কোন কোন ছাত্র আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়াছিল।" দেশজোড়া এই বিশাল উত্তেজনার পিছনে ছিল কিন্তু একটা অতি ক্ষুদ্র বস্তু। শালগ্রাম শিলা।

শরিকে শরিকে মামলা। গড়াতে গড়াতে মামলা এসে উঠল আদালতে। বড় বাজারে থাকেন বটুকনাথ পণ্ডিত। তাঁর পুজোর ঘরে থাকে এক শালগ্রাম শিলা। মামলার জন্যে সেটির দরকার পড়ল আদালতে।

বিলেত থেকে সদ্য কলকাতায় এসেছেন জন ফ্রিমেন নরিস। হাইকোর্টের জজ। সেই জজ সাহেবের হুকুমে শালগ্রাম শিলা আনা হল আদালতের বারান্দায়।

ভুবনমোহন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাবা, 'ব্রাহ্ম পাবলিক

ওপিনিয়ন' নামের এক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক। ভুবনমোহন তাঁর কাগজে নরিস সাহেবের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের প্রতিবাদে লিখলেন এক কড়া সমালোচনা।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদক এবং দেশকর্মী। তখনো বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' হননি। বাগ্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতির গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে ভারতবর্ষে। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রমহলের তিনি তখন আদর্শ পুরুষ। ভুবনমোহনের সমালোচনা পড়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাগজে লিখে বসলেন এক অগ্নিগর্ভ সমালোচনা।

সেদিনটা ছিল ২৮শে এপ্রিল, ১৮৮৩ সালের। পরের দিন 'ইংলিশম্যান' 'বেঙ্গলীকে' ধমকালে এই বলে যে, ঐ লেখার দ্বারা অবমাননা করা হয়েছে হাইকোর্টকে।

৩রা মে হাইকোর্ট রুল জারি করলে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ও মুদ্রাকর-প্রকাশক রামকুমার দের নামে। রুলের মোদ্দা কথা, আদালত অবমাননার অপরাধে কেন তিনি জেলে যাবেন না, তার কারণ দেখান।

আদালতের শমন পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে আত্মস্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে খুঁজে পেলেন নিজের ভুল। জজ সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি যে বিষোদগার করেছেন তার পক্ষে যুক্তিগত সমর্থন কম। কারণ নরিস সাহেব নিজের খেয়ালখুশীতে কাজটা করেননি। পিছনে সমর্থন ছিল বাদী প্রতিবাদী দুদলেরই। তা ছাড়া তিনি মতামত নিয়েছেন বাদী পক্ষের এজেণ্ট গৌরীকান্ত বর্মণের এবং হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের।

এসব সত্যি। তবুও হিন্দুসমাজ হিন্দুর পবিত্র দেবমূর্তিকে আদালতে টেনে আনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা যে জমজমাট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ যাঁদের মতামত নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কেউ সমাজের শিরোমণি নন। ছিলেন বিদ্যাসাগর, মহাত্মা রমেশচন্দ্র

মিশ্র, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। এঁদের মত গণ্যমান্য পণ্ডিতদের মতামত কেন নেওয়া হল না?

৫ই মে। আদালতের শুনানীর দিন। হাতে সময় নেই। নানা জনের কাছে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে রাজী করলেন তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিস্টার হতে। উমেশচন্দ্র রাজী হলেন এই সর্তে যে, সুরেন্দ্রনাথ আদালতে ক্ষমা চাইবেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্মত।

আরম্ভ হল বিচারপর্ব। সুরেন্দ্রনাথ দৃপ্তভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন আদালতের কাঠগড়ায়। দ্বিধাহীন দীপ্ত কণ্ঠস্বর—মুদ্রাকর আমার আদেশেই ছাপার কাজ করে থাকে। সুতরাং তাঁর কাজের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী আমি। আপন কর্তব্যবোধের তাড়নায় এবং জনসাধারণের উপকারের জন্যেই আমি আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলাম এবং যে সংবাদের উপর নির্ভর করে সেটা করেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের' সম্পাদক এই আদালতেরই এ্যাটর্নী। সুতরাং তার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নিশ্চয় নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। আদালত অবমাননা বা মিঃ নরিসকে লাঞ্ছিত করার অভিপ্রায়ে আমি এ-কাজ করিনি। সরল বিশ্বাসে আমি সেদিন যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছি, এখন তা আমি দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

স্বদেশী-বিদেশী মিলিয়ে পাঁচ জুরীর ফুলবেঞ্চ বসিয়ে বিচার। অবশেষে বিচারের সুদীর্ঘ রায় পড়লেন প্রধান বিচারক স্যার রিচার্ড গার্থ।

'বাবু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। আপনি আপনার বেঙ্গলী পত্রিকায় এই আদালতের প্রতি গভীর অবজ্ঞাসূচক প্রবন্ধ লিখিয়া অপরাধী হইয়াছেন। আপনার মনে যাহাই থাকুক না কেন, আপনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, আপনি আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী।....আদালতের মানরক্ষাকল্পে ভবিষ্যতে কাহারও দ্বারা এরূপ

অপরাধ নিবারণ হেতু আপনার অর্থদণ্ড না করিয়া আমরা আপনার প্রতি অপেক্ষাকৃত গুরুদণ্ড বিধান আবশ্যক বোধ করি। অতএব আদেশ করা যাইতেছে যে, প্রেসিডেন্সি জেলে বিনাশ্রমে আপনি দুই মাস কারারুদ্ধ থাকিবেন।....রামকুমার দে-কে মুক্তি দেওয়া হল।"

সুরেন্দ্রনাথের মনের কোণে এরকম আশঙ্কা আগেই দিয়েছিল উঁকি। তাই ব্যারাকপুরের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়েছিলেন আর্শি, চিরুণী, বই, বিছানাপত্র। আশঙ্কা ছিল সুরেন্দ্র-অনুরাগীদের মনেও। পাইকপাড়ার রাজকুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ আদালতে হাজির ছিলেন এক লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে। জরিমানা হলে টাকা মিটিয়ে খালাস করবেন সুরেন্দ্রনাথকে। সে সুযোগ তাঁর মিলল না।

জেল তো হল, কিন্তু জেলে পাঠানো যায় কি করে, এই চিন্তায় বিচারকরা বিব্রত। বাইরে অশান্ত জনতা, উত্তেজিত ছাত্রসমাজ। তাদের সামনে দিয়ে তো সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে? শেষ পর্যন্ত গোপন পথে, যে পথ দিয়ে জজ সাহেবরা যাতায়াত করেন হাইকোর্টে, সেই পথ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে পাঠানো হল হরিণবাড়ি জেলে, ব্রুহাম গাড়িতে চাপিয়ে। বিচারকরা ভাবলেন, যাক ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু তা হল না। ছাত্রসমাজের বুকে বেদনার তোলপাড় উঠল আরো দ্বিগুণ হয়ে।

ফ্রিচার্চ কলেজে ছাত্রসভা। সভাপতি হবার জন্যে ভাবা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। তিনি তখন বাংলার বাইরে। সভার প্রধান বক্তা রূপে উঠে দাঁড়ালেন ছাত্রনেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সেদিন ছাত্রসমাজ বুকের উপর এঁটে নিয়েছিল কালো ফিতেয় বোনা শোকের ফুল। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের বুকে কালো ফিতের বো।

তারপর সভার পর সভা। শুধু কলকাতায় নয়; বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে।

কৃষ্ণনগরে রায় যদুনাথ রায়বাহাদুর, প্রসন্নকুমার বসু, রামগোপাল সান্যাল, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিতমণ্ডলী কৃষ্ণপতাকা উড়াইয়া, কৃষক-মুটে-মজুরের সহিত একত্র হইয়া সভার পর সভা করিয়া সুরেন্দ্র-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।....পাইকপাড়ার ধনকুবের তেজস্বী রাজকুমার ইন্দিরনারায়ণ (ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ) অমরাবিন্দিত সুখভোগ্য হর্ম ত্যজিয়া, নবদুর্বাদল পরিশোভিত ময়দানে বিরাট সভায় সভাপতিরূপে, এবং পীড়িত দুর্বল অশীতিবর্ষ বয়স্ক পলিতকেশ খৃস্টান পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পীড়ার যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া, বিজ্ঞানময়-জীবন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সামান্য বেশে লোকতরঙ্গের সহিত মিশিয়া জনসাধারণের ঠেলাঠেলিতে থাকিয়া সভায় যোগদানপূর্বক সুরেন্দ্র-কারাবাসে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, স্বাধীনচেতা সইয়দ আমেদ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এক মহতী সভার আহ্বান করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীকিষণ প্রমুখ হিন্দুস্থানীগণ সম্মিলিত হইয়া এবং পাঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদে সর্দার দয়াল সিংহ, শিখ সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া সুরেন্দ্রনাথের জন্য মর্মবেদনা প্রকাশ করেন।

বহরমপুরে চব্বিশ ঘণ্টার সংবাদে পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া গ্রাণ্ট হলের বিরাট সভায় চক্ষুর্জল উন্মোচন করেন এবং বর্ধমানের কর্তৃপক্ষ সাহেবগণের নিষেধ সত্ত্বেও বর্ধমানবাসীরা সভা করিয়া সুরেন্দ্র-কারাদণ্ডে সমবেদনা প্রকাশ করেন। মাদ্রাজের তৈলঙ্গী সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে সম দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাড়িত বার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারানিবাসে সুরেন্দ্রনাথের নিকট ও মণিরামপুরে সুরেন্দ্রভবনে সহস্র সহস্র তাড়িত-বার্তা-প্রেরিত সহানুভূতি আসিতে লাগিল। ত্রিপলিকেন হইতে পাঞ্জাব, আসাম হইতে বোম্বাই পর্যন্ত সহস্র দেশ সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডে ব্যথিত

হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে মহামতি লর্ড রিপনের নিকট প্রায় পাঁচশত টেলিগ্রাম গিয়াছিল।"

সেকালের শ্বেতাঙ্গসমাজের মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক তখন রবার্ট নাইট। তাঁর কাগজে বেরুল পর পর কয়েকটি সম্পাদকীয়। প্রত্যেকটিতে হাইকোর্টের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ। যে বিচারে জরিমানার চেয়ে আর বেশী কিছু হওয়া আইনসঙ্গতভাবে আদৌ উচিত নয়, সেখানে জরিমানার কোন সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হাজতবাসের শাস্তি দেওয়া হল কেন? বিচারপতি তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, একদা সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। একথা এ বিচার উপলক্ষে উল্লেখ করায় দুর্মতি স্যার রিচার্ড গার্থকে কে জোগাল? নাইট শুধু সম্পাদকীয় লিখেই সুরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাননি। নিজের গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন জেলখানায়, স্বামী-সন্দর্শনে।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস সেদিন সত্যই গোটা ভারতবর্ষকে মিলিয়েছিল একটা শোকের সূত্রে।

যাঁদের বুকে বেদনা, মনে শ্রদ্ধা আর হাতে কলম তাঁরা আবার লিখতে বসলেন কবিতা। কবিতা কিংবা শোকোচ্চারিত শ্লোক। এই রকম শ্লোক লিখেছিলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা, বন্দী সুরেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ জানিয়ে।

হে সুরেন্দ্র মহাভাগ ধন্যস্ত্বং ধরণীতলে।
যস্যার্থং ভারতং সর্বং ভৃশং শোচতি সাম্প্রতম্॥
ধর্মসংরক্ষণার্থায় কারাগৃহমলঙ্কৃতম্।
যৎত্বয়াস্য মহাসত্ত্ব মন্যেতৎ ত্রিদিবোপমম্॥
ধন্যং কারাগৃহং বঙ্গে ধন্যাঃ কারানিবাসিনঃ।
যস্মিন্ সুরেন্দ্রা ধর্মাত্মা ভাসতে ব্রহ্মতেজসা॥

এক ঝলকে জ্বলে উঠেছিল এই দেশব্যাপী আন্দোলন। কিন্তু

এক ফুঁয়ে নিভে গেল না। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির দিন পর্যন্ত এই অভূতপূর্ব আলোড়নের উদ্দাম দামামা বাজতে লাগল সারা দেশের বুকের মধ্যে।

অবশেষে ৪ঠা জুলাই। বুধবার।

কারামুক্তির দিন সুরেন্দ্রনাথের।

ঘড়িতে তখন সবে বেজেছে চারটে। আকাশে মেঘলা আঁধার। পৃথিবী ঘুমন্ত। কিন্তু এক ব্যক্তির চোখে ঘুম নেই। তিনি জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ল্যারিমোর। আগের দিন তিনিই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছে। চোখে মুখে উৎফুল্ল আবেগ।

সুরেনবাবু, কাল আপনার মুক্তির দিন। ভোর ছ'টায় মুক্তির লগ্ন। প্রস্তুত থাকবেন।

সুরেন্দ্রনাথ অবিচলিত। যেন উদাসীন পর্বত।

ল্যারিমোর চলে যেতেই চব্বিশপরগনার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স সাহেব হাজির। চোখে মুখে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসা।

—সুরেনবাবু, কাল আপনার মুক্তির দিন। মুক্তি-উপলক্ষে আপনার অনুরাগীজনেরা কি রকম সম্বর্ধনার আয়োজন করবেন, মনে হয়?

সুরেন্দ্রনাথ জানালেন, সেটা তাঁর জানবার বা জানাবার কথা নয়।

৩রা জুলাই পার হয়ে ৪ঠা। তখনো ভোরের পাখী জাগেনি। তখনো শুকতারা নেভেনি। মেঘলা পৃথিবী শেষ রাতের স্বপ্নে বিভোর। তখন ঘুম নেই কেবল মিঃ ল্যারিমোর-এর চোখে। শয্যা ছেড়ে তিনি পরে নিলেন ধড়াচুড়া। হয়তো এর পিছনে পরামর্শ ছিল স্টিভেন্স সাহেবের। তিনিই হয়তো বুঝিয়েছিলেন ল্যারিমোর সাহেবকে, সাবধানের মার নেই। যে লোকের কারাবাস নিয়ে কুরুক্ষেত্র ঘটে, তার কারামুক্তি নিয়ে দেশের লোক একটা লঙ্কাকাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে কি?

ল্যারিমোর ছ'টা বাজার আগেই, রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি সুরেন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এলেন জেলখানার বাইরে। প্রহরী গিয়ে

ঘুম ভাঙাল তাঁর। কানে কানে জানাল, গাড়ী প্রস্তুত। ল্যারিমোর তৈরী। সুরেন্দ্রনাথ চেপে বসলেন গাড়ীতে। ঘড়িতে তখন সোওয়া চারটে। আকাশ থেকে নামল বৃষ্টি।

ঘড়িতে যখন ছ'টা সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী এসে থামল তাঁর তালতলার বাড়ির দরজায়। বাড়িতে পা দিয়ে প্রথম মায়ের পায়ে হাত। প্রথম আশীর্বাদ মায়ের হাতের ছোঁয়ায়। বঙ্গবাসীর ভাষায়—

"বুধবার প্রাতঃকালে যখন সুরেন্দ্রবাবুর গলদেশে শতাধিক মাল্য শোভা করিতেছে, যখন তাঁহার বিস্ফারিত নয়ন যুগল হইতে উৎসাহপূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, সুরেন্দ্রবাবু সেই অবস্থায় মাতৃসম্ভাষণে যাত্রা করিলেন। জননীর চরণযুগলে গলদেশের পুষ্প মাল্য অর্পণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সে দৃশ্য স্বর্গীয়।"

আরও এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য ঘটে চলেছে তখন কলকাতায়। তার কথক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

"যেদিন সুরেন্দ্রনাথের খালাস পাইবার কথা, সেইদিন অতি প্রত্যূষে হাজার হাজার লোক প্রেসিডেন্সি জেলের অভিমুখে যাত্রা করে। উহা তখন হরিণবাড়ি জেল নামে অভিহিত ছিল। এবং গড়ের মাঠ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিকট উহা অবস্থিত ছিল। সেদিন শেষ রাত্রি হইতে মুসলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা ভিজিতে ভিজিতে জেলের ফটকের নিকট পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাকে রাত্রি থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ি করিয়া তালতলায় তাঁহার পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন আবার জনতা তালতলার অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথের গৃহ জনাকীর্ণ, আর স্থান নাই; তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বসু বক্তৃতা করিতেছেন।"

সুরেন্দ্রনাথের জীবন চরিতকার সূর্যকুমার ঘোষালের ধারাবিবরণীতে এই দিনের ঘটনার কিছু ভিন্ন রূপ। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী

সুরেন্দ্রনাথ যখন তালতলায় ফি'রে শুনলেন যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে অসংখ্য লোক যাত্রা করেছে হরিণবাড়ির পথে, সুরেন্দ্রনাথ পা বাড়ালেন আবার জেলখানার পথে। বেলা দশটার সময় সহস্র জনতা পরিবৃত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ফিরলেন তাঁর তালতলার বাড়িতে।

শ্রদ্ধা যেখানে সীমাহীন, সভা সেখানে সংখ্যাহীন হয় কেমন করে ?

কোনমতে খাওয়া শেষ। তারপরেই সভায় যোগদান। প্রথম সভা প্রেসিডেন্সী ইনস্টিটিউশন-এ। পরে যার নাম হয়েছিল রিপন কলেজ। সভার আহ্বাহক ছাত্রসমাজ। সভাপতি হাইকোর্টের উকীল ও ঐ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দাস। সুসজ্জিত সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গানের প্রথম কলি, 'কতকাল পরে বল ভারত রে'। ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ। ষাট টাকা দামের দোয়াত। আট টাকা দামের কলম। তারই সংগে ইউরোপের দেশপ্রেমিকদের বেশ কয়েকটা জীবনচরিতের বই। এ ছাড়া আছে মানপত্র। ছাত্র ও শিক্ষকের মিলিত প্রণাম। "We trust that your Patriotic heart has found ample consolation in the fact that your detention in jail has been the means of at least partially realising one of your most cherished wishes, namely, the eliciting of a united voice from your countrymen for a public cause."

পরের সভা ফ্রি চার্চ কলেজ। সভাপতি কলেজের অধ্যক্ষ রবার্টসন সাহেব। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই সুরেন্দ্রনাথকে বরণ করলেন গলায় মালা পরিয়ে।

সেখান থেকে ব্যারাকপুর।

"সুরেন্দ্রনাথ ব্যারাকপুরে পৌঁছিলে পর একজন দীর্ঘকায় পেন্সন-

ভোগী বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ, পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া গলদেশে পদকশ্রেণী ধারণপূর্বক সুরেন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া সহর্ষে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তথাকার অধিবাসীগণ সুরেন্দ্রনাথকে হরেকৃষ্ণ সরকারের বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি জলযোগ করিলেন। হরেকষ্ণবাবুর বাড়িতে সেদিন যে সভা হইয়াছিল, সে দৃশ্য অতি অপূর্ব দৃশ্য। এখানে কলকাতায় বিডন স্কোয়ারে বহুসহস্র লোক একত্র হইয়া সুরেন্দ্রনাথের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় ছিলেন। শালগ্রাম শিলা তাঁকে করে তুলল জন-গণ-মন-অধিনায়ক।

তাঁরই সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক, 'বন্দেমাতম'-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সুরেন্দ্র তর্পণ করেছিলেন এই বলে—

"আমি কিন্তু বক্তা সুরেন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথই বলি না। আমি ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথকে চিনি। যে গুণের অভাবের জন্য বিশ্বামিত্র সৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেও বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই ক্ষমাগুণ সুরেন্দ্রনাথের মেরুদণ্ড বলিলেও হয়। আমাদের বড়লোকদের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুর মতো কেহ গালাগালি খাইয়াছেন কিনা জানি না। কেবল আজই যে লোক তাঁহাকে গালাগালি দিতেছে, তাহা নহে। তিনি আজীবনই গালাগালি খাইয়া আসিতে-ছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কখনো 'উতোর গান নি'। তাঁহার কথাই ছিল, 'আমার পিঠটা এত বড়ো চওড়া, কে ক ঘা মারবে মারুক না।' যে তাঁহাকে ন-কড়া ছ-কড়া করিয়াছে, সেও তাঁহার কাছে যাইলে তিনি তাহাকে বাবু বাছা কহিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান হওয়া কি চারটিখানি কথা? তাঁহার কথার পিছনে এমন একটা ভারতীয় ভাবের নিবিড় স্পর্শ যাহা তিনি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতেন না, কা কথা অন্যেষাম।"

চিড়িয়াখানা ও অশ্বিনীকুমার

বরিশালের ছিল এক রাজা। মাথায় রাজমুকুট ছিল না। ছিল না সোনার সিংহাসন। কিন্তু বরিশালের মানুষ তাঁকে রাজা সাজিয়েছিল তাদের হৃদয়ের সোনার চেয়ে দামী শ্রদ্ধা সম্মান অনুরাগ দিয়ে। সেই রাজার একদিন রাজরোষে বিনা অপরাধে ঘটল নির্বাসন। লক্ষ্ণৌ জেলখানা থেকে নির্বাসন-মুক্তির পর বরিশালে ফিরে সেই রাজা একদিন তাঁর অনুরাগী প্রজাদের সামনে জানালেন —এবার আমি সত্যিকারের রাজা হলাম। "একবার ছোটলাট বেলি বৃষ্টির সময়ে মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন। নির্বাসনের সময় চামরের হাওয়া খাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ জেলের কয়েদীরা মনে করিত আমি কোন সমান্ত নরপতি ; কেননা স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে জবরদস্ত

ছোটলাট হিউয়েট সাহেবের ঐ জেলে শুভাগমন হইয়াছিল। ছত্র, চামর, উপাধি সকলই হইল, বাকি ছিল কেবল রাজদণ্ড। কেন, দীর্ঘ নির্বাসনই তো রাজদণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

লোকপ্রিয়, পরিহাস-প্রিয় এই রাজার নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালের একোমেবাদ্বিতীয়ম নেতা।

সেই অশ্বিনীকুমারের ছিল একটা চিড়িয়াখানা। আজব সব জীবের আড্ডা। অশ্বিনীকুমারের অর্থে ও অন্নে তারা সুখে খায়, আরামে ঘুমোয়। তোফা জীবন।

সরলকুমার দত্ত, অশ্বিনীকুমারের ভাইপো। জ্যেঠামশাই সম্বন্ধে আপন স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"আর একটা মজা আমাদের বাড়িতে ছিল। যাহা আজকাল বড় দেখা যায় না। সমাজের বাহিরে যাহারা, লোকে যাহাদের দূরে রাখিয়া দেয়, আমাদের বাড়ীতে তাহাদের আনাগোনা ছিল। একদিকে পাগল, চরিত্রহীন, গঞ্জিকা-সেবী আর অন্যদিকে সন্ন্যাসী ; এখানে সকল রকমের লোকের ভীড় হইত। সকলেই জ্যেঠামশায়ের অতি প্রিয় ছিল। এবং সকলেই ভাবিত 'বাবু আমাকেই ভালবাসেন বেশী'। পাগল সর্বদমন, গঞ্জিকাসেবী গুরুজান, আজিজ পাগলা, ভেগাই হালদার সকলেই আমাদের বাড়ীকে তাহাদের আপন বাড়ী মনে করিত। খাওয়া-দাওয়া এবং অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইবার ছিল না। বড় বড় অতিথি এবং এই শ্রেণীর লোক সকলেরই পরিবেশন সমভাবেই চলিত। ইহাদের কেহ জ্যেঠামশায়ের সহিত এক তক্তপোষে বসিয়া গল্প করিত। কেহ তাঁহাকে দোস্ত ডাকিত। কেহ আবার গঞ্জিকাসেবন বা অন্য কোন কাজের জন্য আবদার করিয়া বা ধমকাইয়া পয়সা লইয়া যাইত, যেন পয়সাগুলি তাহাদের গচ্ছিত ধন।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক পাগল ও কোন সন্ন্যাসী এক সময়ে আসিয়া স্থান লয়। পাগলটি সন্ন্যাসীর গেরুয়াবস্ত্র দেখিয়া

ও নিশীথে নাম কীর্তন শুনিয়া চটিয়া যায় এবং এই সন্ন্যাসীকে স্থান দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিত, 'এ একটা মস্ত পাগলের আড্ডা এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়।,

সন্ন্যাসী আবার চরিত্রহীনের আশ্রয় প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি জ্যেঠামশাইকে বলিলেন, 'এসব লোককে স্থান দেওয়া কেন?'

জ্যেঠামশাই একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'এ বাড়ীটা একটা চিড়িয়াখানা। আমার মাথাতেও একটু ছিট আছে। তাই চিড়িয়াখানায় থাকিতেই ভালবাসি।"

এ হল অশ্বিনীকুমারের ঘরের চিড়িয়াখানা। কিন্তু তাঁর আরো বড় একটা চিড়িয়াখানা ছিল বরিশাল জুড়ে। তাঁর স্বপ্ন ছিল বরিশালের চিড়িয়াখানার সমস্ত জীবকে তিনি গড়ে তুলবেন মানুষ করে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন চোখে পড়ত তাঁরই কলেজের ছাত্র কিংবা অন্য কোন যুবকের দল নিছক আড্ডা দিয়ে সময় কাটাচ্ছে, কোন বৃহৎ কর্মে তারা উৎসাহহীন, কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যে তাদের চিন্তাভাবনা আলোড়িত নয়, অশ্বিনীকুমারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো ভৎর্সনাবাক্য, 'হ্যাঁরে তোরা সব আর কতদিন এমনি কুকুর ভেড়া হয়ে থাকবি। মানুষ হবি না?'

আবার নিজেও যেহেতু চিড়িয়াখানার বাসিন্দা, কখনও কখনও আত্মশ্লাঘায় নিজেকেও তাঁর মনে হয়েছে কুকুর-ভেড়ার সমতুল্য।

সুরাটে কংগ্রেসের সভা। সভায় প্রস্তাব উঠেছিল অশ্বিনী-কুমারকে সভাপতি পদে বরণ করার। সেদিন অশ্বিনীকুমার সুরাটের পথে বেরুলেই পথের দুধারে জনতা তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে আকাশ মাটি কাঁপিয়ে তুলতো তাঁদের উল্লসিত চীৎকারে— 'অশ্বিনীকুমার দত্ত কি জয়।' খ্যাতি-মোহহীন অশ্বিনীকুমার মনে মনে হাসতেন তখন।

"আর আমি মনে বলিতাম, ভোলা কুকুরকি জয়।" এই হলেন অশ্বিনীকুমার। অন্যে পরে ভেদ নেই।

নিজের বরিশাল জোড়া বিশাল চিড়িয়াখানার প্রত্যেকের প্রতি, বিশেষ করে যারা অভাজন-অবজ্ঞাত তাদের প্রতি তাঁর যেন অন্তহীন মমতা।

মৃত্যুর মাত্র দেড় বছর আগের ঘটনা।

বরিশালের সরকারী উকিলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জেনেছেন মৃত্যু আসন্ন। শরীর ক্ষমতাহীন, ক্লান্ত। আর ঠিক তখনই সরকার পক্ষ থেকে চরম আঘাত এসে বেজেছে বুকের পাঁজর, দেহের রক্ত বিন্দু দিয়ে গড়া তাঁর ব্রজমোহন কলেজের উপর। অথচ তিনি নিরুপায়। কথায় কথায় সেদিন তিনি বন্ধুকে জানালেন নিজের মর্মবেদনা—

"নির্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।"

বন্ধু প্রশ্ন করলেন—"কোন্ দেশে ?"

"এই ভারতবর্ষে।"

"কোন্ প্রদেশে ?"

"সোনার বাঙ্গলায়।"

"কোন্ জেলায় ?"

"তাও আবার বলিতে হয় ? বরিশালে। কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না। কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোক তো আর দেখিতে পাইতেছি না। একজন ছিল, আপনি তাহাকে ফাঁসি দিয়াছেন।"

"কে সে ?"

"আবদুল।"

আবদুল এক ভয়ংকর দস্যুর নাম। সে ছিল নরঘাতক। নির্মম ডাকাত। কিন্তু তার ছিল একটি মাত্র মহৎ গুণ, সে নির্ভীক। ফাঁসির আগের দিন রাত্রেও সে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগ চিত্তে ঘুমিয়েছিল।

ঘরের ভিতরে যেমন পাগল, সন্ন্যাসী, গাঁজাখোর, চরিত্রহীন এরা

সব তাঁর চিড়িয়াখানার বাসিন্দা, ঘরের বাইরের চিড়িয়াখানাতেও তেমনি তাঁর প্রিয়জন হল দুর্দান্ত ডাকাত, গাড়োয়ান, দারোয়ান, গরীব মুসলমান চাষী, দরিদ্র ছাত্র, হাভাতে জেলে-জোলা, মুচি-মেথর হাঘরে ভিখারী। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে এরাই ছিল তাঁর মনের মত আপন জন। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' বইয়ে লিখেছেন—"একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে আহারান্তে অশ্বিনীকুমার তাঁহার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, একজন দরিদ্র মুসলমান বেঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। সেখানে আসবাবেরও বিশেষ বাহুল্য নেই। খান দুই কেদারা।........একখানা বেঞ্চ আর একখানা তক্তাপোশ। তক্তাপোশখানির উপর একটা শতরঞ্জির উপর সাদা চাদর বিছান, গোটা দুই তাকিয়া বালিশ। ঐখানেই অশ্বিনীকুমার বসিতেন। বালিশের প্রয়োজন হইত আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য। মুসলমান কৃষকটিকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমার আর তক্তাপোশের দিকে গেলেন না। বেঞ্চের উপর সেই অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকের কাঁধে হাত দিয়া বসিলেন; বলিলেন—"কী ভাই, অনেকক্ষণ একলা বসাইয়া রাখিয়াছি বোধ হয়?"

মুসলমান কৃষকটি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দিল,—"বাবু, আপনার কাছে আসিয়াছিলাম একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে। কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিতেই তাহার জবাব মিলিয়া গিয়াছে। আপনারা বক্তৃতার সময়ে বলিয়া থাকেন, আমরা সকলে সমান সকলেই ভাই ভাই। আমার সন্দেহ, হইয়াছিল, সে কথাটা সত্য কিনা। কিন্তু আপনি যখন আমার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে আমার কাঁধে হাত দিয়া বসিলেন, তখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। বাবু আপনাকে সেলাম!"

বরিশালের এক মেথরের নাম গোপাল। লোকটা মদ্যপ। আর অশ্বিনীকুমার ঘোরতর বিরোধী মদ্যপানের। কিন্তু একটা

জিনিস চোখে পড়ল তাঁর। জল ঝড়ে আকাশ ভেঙে পড়ুক, দুর্যোগ-দুর্বিপাক যাই-ই ঘটুক না কেন, গোপাল কর্তব্যে একনিষ্ঠ। ঘড়ির কাঁটা ধরে সে কাজ করে। এক মিনিট তার দেরী নেই, একদিনও তার কামাই নেই। একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে গোপাল। দেখতে পেলে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের আপনপ্রিয় 'বাবু'। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, তাকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বললেন—'গোপাল, তুই আয়, আমায় কোল্ দে।'

আর একদিনের ঘটনা। তখন তিনি বার্ধক্যে বেঁকে গেছেন। বহু মূত্রের রোগী। সেই সময় প্রতিদিন বিকেলে শহর ছাড়িয়ে তিন চার মাইল হেঁটে বেড়ানো ছিল নিয়মিত অভ্যেস। সঙ্গে থাকতো শিষ্যেরা।

যেতে যেতে একদিন দেখতে পেলেন রাস্তার উপরে একজন মুসলমান রক্ত বমি করছে। অশ্বিনীকুমার তখুনি তাঁর শিষ্যদের পাঠালেন হাসপাতালে, স্ট্রেচার আনতে। শিষ্যরা চলে গেলে তাঁর মনে হল, স্ট্রেচার আনতে আনতে এই রোগীর যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তো সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তিনি নিজের পিঠে তুলে নিলেন রোগীকে। চললেন শহরের দিকে। সেই মুসলমান রোগ-মুক্ত হয়ে অশ্বিনীকুমারের কাছে লিখেছিল এক চিঠি। তাতে লেখা —"আমার পৃষ্ঠচর্মে আপনার পায়ের পাদুকা নির্মাণ করিয়া দিলেও এ ঋণের পরিশোধ হইবে না।"

১৯০৮। ইংরেজ সরকারের আতংক অশ্বিনীকুমারকে পাঠানো হল নির্বাসনে, বিনা অপরাধে, কুখ্যাত তিন আইনের পরোয়ানায়। পূর্ববঙ্গের জাঁদরেল ছোট লাট বামফীল্ড ফুলারের নির্দয় নৃশংস অত্যাচারেও বরিশালকে যে ভাঙা তো দূরের কথা, তার স্বদেশী আদর্শ থেকে মচকানো গেল না এতটুকু, তার মূলে যে নায়ক তাকে যদি মূলশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে বাংলা দেশের বাইরে বহু দূরের জেলখানার অন্ধ কুঠরীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো ইংরেজশাসন

বরিশালের মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসবার জায়গা পাবে, এই আশাতেই সেই নির্বিচার নির্বাসন।

স্বরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন—

"বেলা ১০টা কি ১১টার সময়ে কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী কয়েকজন দেশীয় সিপাহী লইয়া যখন অশ্বিনীকুমারের বাড়ীতে উপস্থিত তখন তিনি জগদীশবাবুর বাসায় ছিলেন। খবর পাইয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। কেমন করিয়া সমগ্র বরিশালে রাষ্ট্র হইল, অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে পুলিশ আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকারণ্য হইয়া গেল। বাড়ীতে এখন ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, ক্ষুব্ধ জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অশ্বিনীকুমার যদি বিপ্লববাদী হইতেন, তখন তাঁহার এক ইঙ্গিতে ঐ সামান্য কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর ভাগ্যে কী ঘটিত, কে বলিতে পারে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমস্ত গুছাইয়া লইলেন, গ্রন্থের মধ্যে লইলেন খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপা একখানা শ্রীমদ্ভাগবত। বাহির হইবার পূর্বে ভিতরের কক্ষের দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"লাজপৎ রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ তাহাই।....তারপর অশ্বিনীকুমার গাড়ীতে উঠিলেন। সহসা দ্বিপ্রহরের সূর্য কয়েক মুহূর্তের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল, সেই বিরাট জনতা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আর সেই মহাশব্দে ভীত অশ্ব একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। তারপর আবার গাড়ী ছুটিল, পশ্চাতে সেই জনতা। সমস্ত বরিশাল সেদিন নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল।"

এরই মাঝে ঘটে গেছে আরেকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঘর থেকে বেরিয়ে অশ্বিনীকুমার যখন গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ জনতার ভীড় ঠেলে শস্ত্রপাণি শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের মুখের সামনে এগিয়ে এল একটা পাগল। হাতে একটা মড়ার মাথা। পাগল সেই মড়ার মাথাটাকে শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের রক্তচক্ষুর সামনে উঁচু করে তুলে ধরে চীৎকার করে উঠল,—

"এ অধর্ম্ম ভগবান বেশীদিন সইবেন না। দুদিন পরে পরিণাম যা হবে, তা এই আমার হাতে।"

লোকটা কি অশ্বিনীকুমারের চিড়িয়াখানার সেই আজিজ্ পাগলা? কিংবা হয়তো আজিজ নয়, অশ্বিনীকুমারের অন্নে লালিত অন্য কোন পাগল। এই নির্বাসনে সে হারাবে তার আশ্রয়, তাদের সাধের সুখের নীড়, এটাই হয়তো তার সেদিনকার দুঃখ বেদনা উত্তেজনার উৎস। নির্বাসনে গিয়েও কিন্তু অশ্বিনীকুমারের চিড়িয়াখানার প্রতি ভালবাসা উড়ে গেল না। লক্ষ্ণৌ-এর কয়েদ-খানাকেও দেখতেন চিড়িয়াখানার দৃষ্টিতে।

জেলে বসেই গান লিখলেন—

আমায় সখের কয়েদ করেছে,
খাবার শোবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।
পূরব-জনমে যেন
কার গো সুখের ময়না ছিনু
নবাব ছিল সে এই লক্ষ্ণৌ
তাই হেথা এনেছে। ইত্যাদি।

তারপর একদিন লক্ষ্ণৌ-এর ইংরেজ জজ্ সাহেব আর ম্যাজিস্ট্রেট এলেন অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় জানালেন, তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে শিগ্‌গীর। সেই সঙ্গে একটি সবিনয় নিবেদন। সেটা কি? না, যাবার আগে আপনাকে এই গৃহ-প্রাঙ্গণে করে যেতে হবে একটা বৃক্ষরোপণ। পরে আমরা সগর্বে বলতে পারবো, এখানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নিজের হাতে রোপণ করা গাছ আছে।

অশ্বিনীকুমার প্রথমে গররাজী। বললেন,—"আমি নিঃসন্তান। আমার কোথাও কোন চিহ্ন থাকে, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নয়।"

সাহেবরা নাছোড়বান্দা। শেষে সম্মত হয়ে অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞেস করলেন,—"আচ্ছা, কি গাছ লাগাতে হবে।"

সাহেবরা বললে,—"যে গাছ আপনার পছন্দ।"

অশ্বিনীকুমার হাসলেন। হেসে বললেন, "আমি সরষে গাছ লাগাব।"

মুক্তিলাভের পর বরিশালে ফিরে বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন,— "ভাবলাম, যাই ব্যাটাদের ভিটেয় সরষে বুনে।"

কর্তব্যপ্রিয়তায়, কৌতুকপ্রিয়তায় অশ্বিনীকুমার একটা সরেস, একটা সরস মানুষ। এই দুটি গুণের দৈব সমাহারই তাঁকে দিয়েছিল সমগ্র জাতির সম্মানলাভের সুবর্ণ সুযোগ, অবিসম্বাদি নেতার স্বর্ণ-সিংহাসন।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন,—"কেবল ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোকপ্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোকনায়ক বলা যায় না। বস্তুত আমাদের বর্ত্তমান কর্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।"

কাঁচকলা ও
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

একটা গল্প বলি শোন। একজনের বাপের পায়ে ছিল বিরাট গোদ। ছেলে কোন দোষ করলেই বাপ শাসায়—এই গোদা পায়ে মারবো এক লাথি। ছেলে গোদের বহর দেখে ভয়ে জড়োসড়ো। একদিন বাপ ছেলেকে সত্যিই লাথি মারল। লাথি খেয়ে ছেলে তো অবাক। ওমা, এ যে তূলোর বস্তা। ব্যস, এতদিনের ভয় ঘুচে গেল এক নিমেষে। ঠিক তেমনি আমরাও ইংরেজদেরকে অনেকদিন ধরে ভয় করে আসছি। এটা আমাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে। সেই ভয়টাকে ভাঙতে হবে। সেইজন্যেই আমার 'সন্ধ্যা'র ভাষাটা এই রকম। লোকে না-হয় বলবে, 'উপাধ্যায়টা ইতর'। কিন্তু ইংরেজকে 'ফিরিঙ্গী' বলতে শিখলে লোকের ইংরেজ-ভীতিটা ঘুচবে। সেইটেই আমাদের পরম লাভ।

ইংরেজকে 'ফিরিঙ্গী' বলতে শেখানোই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজের একমাত্র বাহাদুরি নয়। সমগ্র 'সন্ধ্যা' কাগজের ভাষার বুননিটাই ছিল বিচিত্র। সাধারণ মানুষের মুখের সহজ কথার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের গভীর চিন্তার ভাষার সে যেন এক যুগলমিলন।

ইংরেজ যেখানে ফিরিঙ্গী।

লর্ড মর্লি, মর্লি মিঁয়া।

বাংলার তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল গ্রেগরী সাহেব. গড়গড়ি সাহেব।

লালা লাজপৎ রায় আর সর্দার অজিত সিংহকে নির্বাসিত করলেন পাঞ্জাবের ছোটলাট। নির্বাসন দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই পীড়িত হয়ে পড়লেন লাট সাহেব। উপাধ্যায় 'সন্ধ্যায়' লিখলেন—

হাতে হাতে শোধ
লাটের পায়ে গোদ।

স্বদেশী যুগে পূর্ণ লাহিড়ী একজন ডাকসাইটে গোয়েন্দা। স্বদেশী ওয়ালাদের পাকড়াও করতে তাঁর পাকা হাত। উপাধ্যায় যেদিন আঁচ পেলেন, তাকেও গ্রেপ্তার করার মতলব আঁটছে ইংরেজ সরকার, অমনি 'সন্ধ্যা' কাগজে বেরুল—

সে সুখের দিন কবে বা হবে।
টিকটিকি পূর্ণ লাহিড়ী ওয়ারেন্ট হাতে দেবে॥
কারাগার স্বর্গ মানি।
মা বলে টানবো ঘানি॥

উপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় রচনার নামগুলোও হত অদ্ভুত। 'যুগান্তর' কাগজ ক্রমাগত রক্তে-আগুন জ্বালানো লেখা ছেপে চলেছে। তাই দেখে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সময় অসময় নেই, এসে হানা দিচ্ছে আপিসে। 'সন্ধ্যা 'এই হানাদারদের উপর কটাক্ষ হানল—

যুগান্তরের রক্তারক্তি
টিকটিকির ফাটল পিত্তি।

বরিশালে পুলিশী তাণ্ডব। ধরপাকড়, মারধোর। ব্রহ্মবান্ধব তার প্রত্যক্ষদর্শী। 'সন্ধ্যা'য় লিখলেন—

বিপিনবাবু ভয়ে ভয়ে দেখিয়ে দিলেন নাভীর নীচ
আমি হলে নির্ভয়েতে দেখিয়ে দিতাম ধুধুর বীচ।

ঘটনায় প্রকাশ বিপিনবাবু পুলিশের লাঠির তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ছুটেছিলেন।

এরকম সুভাষিতের নমুনা সংখ্যাহীন। সুপঠিত হওয়ার পক্ষে এই সরসতাই 'সন্ধ্যার' স্মরণীয় অবদান।

যাদুগোপাল মুখার্জি সেকালের একজন হাতে-কলমে বিপ্লবী। নিজের স্মৃতিকথায় 'সন্ধ্যা'-প্রসঙ্গে যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন. পক্ষান্তরে সেটা উপাধ্যায়-প্রশস্তি।

"খুব সাধারণ লোকের মনকে পেয়ে বসেছিল 'সন্ধ্যা' কাগজ। এর মাস্তিক বা শিরোনামা এবং সম্পাদকীয় লেখার ঢং একটা সত্যি নতুন জিনিস ছিল। এ-লেখায় অল্প-শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতরা 'মন বাঁধা প্রাণ বাঁধা' কিছু মাল পেয়ে যেত।

'লে মাটি, দে চাপা'; 'সুশীলের তুড়ি লাফ' 'ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ' 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে' 'কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা', 'ক্ষুদে লাট ফুলার' 'লাঠি খটাখট বম ফটাফট', ইত্যাদি যখন কাগজ-ফেরিওয়ালার আকাশ ফাটানো গলায় বেরুত, সে কি ভিড় জমে যেত তার চার পাশে-একখানা 'সন্ধ্যা' দৈনিক খরিদ করতে। টিনওয়ালা, ছুতোর মিস্ত্রী কামার-কুমার, ছোট দোকানদার কে না কিনত এ কাগজ?"

নিজের কাগজের চেয়ে উপাধ্যায় নিজে ছিলেন আরও বিচিত্র ধাঁচের মানুষ। এক জীবনে যেন একশোটা মানুষ। আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে ব্রাহ্ম। কেশব সেনের অন্তরঙ্গ শিষ্য। কেশব সেনের মৃত্যুর পর সিন্ধুদেশে পাড়ি দিলেন সেখানে সোৎসাহে ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারের বাসনায়। সেখানে গিয়ে হয়ে গেলেন খ্রীষ্টান। নতুন নাম হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ফিরলেন

কলকাতায়। মারা গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। উপাধ্যায় আবার বদলে গেলেন। আবার অস্থির। স্থির করলেন, বিলেতে যাবেন বেদান্ত প্রচারে। বিবেকানন্দের মুখের বাণী ও বুকের বেদনাকে বিদেশের মাটিতে আবার মুখরিত করে তোলাই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যাবার আগে কিছুদিনের জন্য হয়ে উঠলেন বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

বিলেতে শুরু হল বেদান্ত-বিতবণ। কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড কম্পমান। আবার ফিরে এলেন স্বদেশে। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার ফিরে এলেন গোঁড়া হিন্দুয়ানীর জগতে। কট্টর খ্রীষ্টান বদলে গেল সনাতনী ব্রাহ্মণ সন্তানে। একি শুধু খেলা? নিছক খেয়ালীপনা? তাই যদি হবে, তাহলে চোখের কোণে কোণে ঐ যে দপদপে আগুনের শিখা, তা এল কোথা থেকে? তা কিসের? ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে উত্তরণ যদি কোন উত্তরের খোঁজে না হয়ে হতো নিছক খুশি মেটানো, তাহলে কি প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকারের বর্ণনা হয়ে উঠতে পারতো বন্দনার মত উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল?

বিলেত থেকে সদ্য পা ফেলেছেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ মুখুজ্যের 'ডন সোসাইটী' থেকে এল ডাক, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর বিলেতী-অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে। ডন সোসাইটীর ছাত্র বিনয় সরকার, বয়স তখন ১৭, সেই সভার একজন উৎসুক শ্রোতা। উপাধ্যায় সম্পর্কে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর পরিণত জীবনের রচনায় ফুটে উঠেছে উদ্দীপ্ত উজ্জ্বলরূপে।

"গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতো। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই—গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি এক নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনো আমি বিবেকানন্দী দলের কোন স্বামিজীকে দেখিনি।........ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতার সর্ব-প্রথম আধুনিক-বাঙালী সন্ন্যাসী।...তাঁর চোখের ও হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে।"

বিনয় সরকার আশ্চর্যভাবে খুব খাঁটি কথাটাই মনে করেছিলেন। দুনিয়াকে না হোক, অন্তত ইংরেজ-সরকারকে তিনি যে কলা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে, একেবারে অবিশ্বাস্য রকমের, সত্যি।

এবার সেই কলা-দেখানোর রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

১৯০৭ সালের ৩১শে আগস্ট ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেফতার করল ইংরেজ সরকার। সেই সঙ্গে 'সন্ধ্যা'র মুদ্রাকর হরিচরণ দাস। অপরাধ? 'সন্ধ্যার' পাতায় পাতায় রাজদ্রোহাত্মক রচনার ছড়াছড়ি। তবে গ্রেফতারের পক্ষে রয়েছে একটি বিশেষ রচনার উগ্র উত্তেজক ভাব ও ভাষা। নাম 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'। সরকারী বিচারে এই লেখাটি আগুনে বোমার মত বিস্ফোরক।

গ্রেফতারের পর জামিনে খালাস হয়ে আবার এক প্রবন্ধ লিখলেন উপাধ্যায় নিজের কাগজে। নাম দিলেন—'আমি যাব চলে কাঁচকলা দেখিয়ে।'

পরিচিত-অনুগতের দল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তাঁর এই গ্রেফতারে। তাদের চোখ-মুখে মামলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানাবিধ দুশ্চিন্তা। উপাধ্যায় কিন্তু নিরুদ্বেগ। তিনি একটি সম্পাদকীয় রচনায় মামলা সম্পর্কে একই সঙ্গে সরকার পক্ষ ও আত্মীয়জনদের সমস্ত দুশ্চিন্তার জবাবে লিখলেন—

'অষ্টরম্ভা ভবিষ্যতি।'

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল বিচারের দিন। আদালতে যেতে হবে। উপাধ্যায় তাঁর সহকর্মীকে ডেকে বললেন—

হ্যাঁ হে, আমি যে আদালতে যাব, কি পরে?

কেন, যা পরে আছেন।

ছিঃ। ফিরিঙ্গীর আদালতে যাব গেরুয়া বসনে? আমি সন্ন্যাসী। গেরুয়া আমার বড় প্রিয় পোশাক। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আদালতে

যাবে না। যাবে ভবানী বাড়ুয্যে। আমাকে একটা পৈতে এনে দাও। গলায় পরবো।

পৈতে এল।

এনেছে? এবার নিয়ে এস একটা বিয়ের টোপর। একটা ফুলের মালা। আর সেই সঙ্গে একছড়া কলা। কাঁচকলা হয় যেন।

সেকি? কাঁচকলা কি হবে?

আনই না হে, কি হয় দেখতে পাবে।

যথাসময়ে যা দেখতে পাওয়া গেল তা হল—"বিচারের দিন কাছারী যাবার সময় শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাকর হরিচরণবাবুকে বর সাজালেন। তাঁর মাথাতে টোপর, গলাতে গড়ে ফলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে দর্পণ, পরনে জরিপেড়ে তাতের ধুতি, গায়ে রেশমের পাঞ্জাবি। হরিচরণবাবু যেন বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বরকর্তা সেজে সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন উপাধ্যায় মশাই। তাঁর পরিধানে সুন্দর পরিষ্কার জামা-কাপড, গলাতে ফুলের মালা, আর হাতে একছড়া কলা। যাবার সময় মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিল। যাত্রার সময় তিনি চতুর্দিকে অনুরক্ত নরনারীদের প্রবোধ দিয়ে বললেন—বেটাদের 'আমি কলা দেখিয়ে চলে যাব।'

বিপ্লবী যাদুগোপালের বর্ণনায় এরই একটু ভিন্নতর রূপ—"আদালতে হাজির হবার দিন তিনি বেরুলেন যেন ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন। মুদ্রাকর হরিচরণকে সাজালেন বর। নিজে সাজলেন বরকর্তা। হাতে একছড়া কলা। একজন শাঁখ বাজাতে বাজাতে চললেন। গাড়িতে তিনজন এইভাবে যাওয়ায় ফিরিঙ্গী আদালত ও বিচারককে নিয়ে তো প্রহসন করা হলই, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গী সরকারকেও। আদালতে বেজায় ভিড় হয়। তিনি বলেছিলেন—ফিরিঙ্গী সরকার তাঁকে জেলে দিতে পারবে না।

ছেঁড়া চটির মত তিনি জেলে যাবার আগে দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন। হলও তাই।”

বিচার চলেছে আদালতে। বিচারক সেকালের ঢুঁদে ইংরেজ কিংসফোর্ড। হিন্দু রাজদ্রোহীদের উপর হাড়ে চটা। আদালতের মঞ্জুর পেলে তিনি এদের হাতে মাথা কাটতে পারেন, এমনি খড়্গহস্ত তাঁর মনের ভাব।

উপাধ্যায় দীর্ঘ দিনের হার্নিয়া রোগী। বিচারের ধকল পোয়াতে গিয়ে তীব্র হল অসুখটা। সেই অবস্থায়ও আসামীর কাঠগড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছেন। কিংসফোর্ড এমনই বেহায়া বিচারক যে, তাঁর মত অসুস্থ, যন্ত্রণাকাতর রোগীকেও বসবার অনুমতি দিতে গররাজী। কে যেন একবার তাকে বলেছিল—আপনার জন্য একটা চেয়ার এনে দেব। ‘শুনে উপাধ্যায় অগ্নিশর্মা।

কেন হে? তোমাকে দয়া দেখাতে হবে কেন? আমি কি চোর-ডাকাত? খুনের আসামী? যে ফিরিঙ্গীর কাছ থেকে আমার জন্য দয়া ভিক্ষে করতে হবে? কিংসফোর্ড যদি ভদ্রলোকের বেটা হয়, তারই উচিত আমাকে আসন এগিয়ে দেওয়া।

বিচার চলতে চলতে হার্নিয়ার যন্ত্রণাও বেড়ে চলল। শেষকালে এমন অবস্থা যে, হাসপাতালে ভরতি না হয়ে উপায় নেই। উপায় নেই অস্ত্রোপচার ছাড়া। তখনকার বিখ্যাত সব চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে উপাধ্যায়কে ভরতি করা হল ক্যামবেল হাসপাতালে।

উপাধ্যায়-পক্ষের কৌসুলী চিত্তরঞ্জন। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন উপাধ্যায়কে উদ্ধারের জন্য। একদিনের ঘটনা। সেদিন তিনি জেরা করছেন সরকার পক্ষের অনুবাদক নারায়ণ ভট্টাচার্যের। সকাল থেকে শুরু হয়েছে জেরা-পর্ব। চারটে বেজে গেছে। তখনও তিনি অন্ন স্পর্শ করেননি। শরীর অবসন্ন। কিংসফোর্ড সাহেবের তখনও চেয়ার ছেড়ে উঠবার নাম গন্ধ নেই। যেন পাথরের স্ট্যাচু। ক্ষুধার্ত চিত্তরঞ্জন জানালেন,—আজকের জেরা

এখানেই বন্ধ থাক। কিংসফোর্ডের জবাব—না, আজই শেষ করতে হবে জেরা। যতক্ষণ চলে চলুক। আপনার কোন 'আর্গুমেন্ট' শুনতে চাই না। ক্রোধার্ত হয়ে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। এই ন্যায়নীতিহীন আদালতে আর পা দেবেন না প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

হাসপাতালে উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে চিত্তরঞ্জন জানালেন—আপনাকে জেলে যেতেই হবে। আর উপায় নেই। আমি আদালত ছেড়ে চলে এসেছি।

উপাধ্যায় কোথায় বিচলিত হবেন। মুখে দেখা দেবে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। চোখে ফুটে উঠবে হলুদ উদ্বেগ। শুকিয়ে যাবে ঠোঁটের গোলাপি হাসি। তা নয়, তার বদলে উপাধ্যায় যেন উদ্বেগহীন উৎসাহে ভরপুর। অবিচলিত চিত্ত। চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকালেন সহাস্যে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ফিরিঙ্গীর সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়।

মামলায় হারলে ?

তার আগেই আমি বেটাদের অষ্টরম্ভা দেখিয়ে চলে যাব।

সবাই ভেবেছিল, এ নিছক কৌতুক-কথা। ইংরেজ-বিদ্বেষের অত্যুগ্র উদ্দীপনায় এটা একটা মনভোলানো সান্ত্বনা। কিন্তু সেটা যে কতখানি সত্য, তা প্রমাণ হতে বেশীদিন গেল না। কলকাতা শহর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে 'বন্দেমাতরমে'র পাতায় দেখতে পেল, কয়েকটি অবিশ্বাস্য কালো অক্ষর তাদের চোখের সামনে চিতার মত রক্তিম আগুনে জ্বলছে।

"দা গ্রেট উপাধ্যায় মিস্টিক্যালি বোর্ন অ্যাওয়ে ফ্রম আস অন দা উইংস অফ এ কাইণ্ডলি ডেথ।"

তারপর ?

"চারিদিক হইতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান যুবক বৃদ্ধ দলে

দলে তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য হাসপাতালের দিকে ছুটিল।"

তারপর ?

"যে সুন্দর তনু শ্যামনগর ও ভাটপাড়ার বাগানে ও জঙ্গলে, চুঁচুড়ার ভাগীরথী বক্ষে, গোয়ালিয়রের দুর্গে, রাজপুতনার মরুভূমি প্রদেশে, হিমালয়ের নিবিড় অরন্যে, অক্সফোর্ডের দার্শনিক সভায়, কলিকাতার বিডন উদ্যানে, এলবার্ট হলে এবং ভারতের নানা স্থানে নানা কার্যে এতদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিত, আজ তাহা শ্মশানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল।"

তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কলকাতার মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে, উপাধ্যায় ছিলেন তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাই এই মৃত্যু তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু। তা যদি না হবে, তাহলে কোন্ বিশ্বাসে তিনি বলিষ্ঠ উচ্চারণে জানাতে পেরেছিলেন—

—ফিরিঙ্গীদের আমি কলা দেখিয়ে চলে যাব।

জন্ম থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে উপাধ্যায় যেন এক মহৎ উপন্যাসের উপকরণ। এবং এক মহানায়কও।

কাঠের চেয়ার ও বিপিন পাল

একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন। ঝোড়ো যুগের হাওয়া। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে বয়ে ছিল ইংরেজীয়ানার হাওয়া। এ হাওয়া তার উল্টো পিঠের। স্বদেশীয়ানার। স্বদেশকে জীইয়ে তুলতে হবে শক্ত করে, লোহার পেশীতে, বজ্রে গড়া পাঁজরে। গায়ের জোরে ইংরেজ দখল করেছে ভারতবর্ষ। বাঙালীকে ফিরে পেতে হবে তার হারানো বাহুবল। তবেই রাহুমুক্ত হবে দেশ।

কিন্তু বল আসবে কোথা থেকে? তার জন্য চাই মাঠের ফসল, ঘাটের মাছ। ইংরেজরা চায় এর ঠিক বিপরীত। ভারতবাসী দুর্বল, অকেজো হয়ে থাকুক দুর্ভিক্ষে-দারিদ্র্যে। রোগা হাড়ে লোহার শিকলগুলো সহজে ক্ষইবে না, ভাঙবে না।

সুতরাং হাতের জোর আর ভাতের জোর দুটোকেই একসঙ্গে গড়ে তুলতে হবে দেশের ভিতর। এই রকম একটা গভীর দেশানুরাগের প্রাণোচ্ছ্বাস থেকেই 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা, নবগোপাল মিত্র। ইংরেজ-বিদ্বেষ তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। আর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাতীয়তাবোধ। তিনি যা করেন, যা গড়েন, যা ভাবেন সব কিছুতেই 'ন্যাশনাল'-এর রং মাখানো। তাঁর ক্লাবের নাম ন্যাশনাল। ব্যায়ামাগারের নাম ন্যাশনাল। পত্রিকার নাম ন্যাশনাল। এমন কি হাড়-গোড় বের করা একটা মড়াখেকো ঘোড়া জোগাড় করে তিনি বাঙালীর প্রথম যে সার্কাস পার্টি খুললেন, তাঁর নামেও ন্যাশনাল। অবনীন্দ্রনাথের অবর্ণনীয় বর্ণনায় সেই সময়ের ছবি যেন পটে আঁকা।

"একটা ন্যাশনাল স্পিরিট কি করে জেগেছিল জানিনে, কিন্তু চার দিকেই ন্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে আমার জ্যাঠামশায়ের আমলের, বাবামশায় তখন ছোট। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল। তিনিই সর্ব-প্রথম ন্যাশনাল কথাটার প্রচলন করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দু মেলা' শুরু করেন।

তখনো ন্যাশনাল কথাটার চল হয় নি। হিন্দু মেলা হবে, জ্যাঠামশায় গান তৈরী করলেন,

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

এই হল তখনকার জাতীয় সংগীত। আর একটা গান গাওয়া হত, সে গানটি তৈরী করেছিলেন বড় জ্যাঠামশায়—

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি—
রাত্রিদিবা ঝরে লোচন বারি।

এই গানটি বোধ হয় রবি কাকাই গেয়েছিলেন 'হিন্দু' মেলাতে।

এই হল আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর, যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল।"

'হিন্দু মেলা' বসে প্রত্যেক বছরই। সেখানে হয় বক্তৃতা, নাচ গান, কথকতা। হয় ব্যায়ামের প্রদর্শনী। বন্দুক ছোঁড়া, তলোয়ার খেলাও বাদ যায় না। বসে দেশী পণ্যের বাজার। মাটির পুতুল, ছবি, খেলনা, শোলার কাজ শাড়ি গয়না সবই মিলবে সেখানে। এরই পাশে ঠকঠকিয়ে চলছে হয়তো দেশী তাঁত। কোথাও বেদে-নীরা বসেছে পসরা সাজিয়ে। কোথাও বাঈজীরা ধরেছে পান-রাঙানো ঠোঁটে মন-রাঙানো গানের রস-কলি।

সব মিলিয়ে একটা প্রাণময় উৎসব। জ্ঞানও আছে, গানও আছে। একদিকে দেখানো হচ্ছে স্বদেশের কিসে উপকার হয়। আর একদিকে জমানো হচ্ছে স্বদেশের আছে কি কি উপকরণ।

সেবার ছিল 'হিন্দু মেলা'র শেষ বছর।

বিপিনচন্দ্র পাল তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। স্বদেশীয়ানার ডাক বেজেছে প্রাণে। সুরেন্দ্রনাথ তখন ছাত্র মহলের একচ্ছত্র সেনাপতি। যেমন গলা, তেমনি বলা। তাঁর ডাক কানে তুলতেই প্রাণে তুফান ওঠে গর্জে।

বিপিনচন্দ্রের নিজের স্বীকারোক্তি—

"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহযোগে কলিকাতার ছাত্র মহলে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন।....আমরা কেবল সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষান্ত রহি নাই। স্বদেশের উদ্ধারের জন্য যৌবনসুলভ উৎসাহ ও কল্পনার প্রেরণায় যথা সম্ভব আয়োজন ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। এই ভাবের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের 'আখড়া'য় যাইয়া ভর্তি হই। এই সূত্রেই সেবারকার হিন্দু মেলাতেও আগ্রহসহকারে যোগদান করি।"

সেবারের মেলা বসেছে টালায়, রাজা বদনচাঁদের বাগানে। মেলা বেশ জমে উঠেছে। রাজনারায়ণ বসু, যিনি এই 'হিন্দু মেলা'র ভাবদাতা জনক, তিনিও সেদিন উপস্থিত। তবে সেদিন কোন বক্তৃতা করেন নি। দুপুরের দিকে শুরু হল ব্যায়াম প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর শেষে যোগ্য প্রদর্শকদের দেওয়া হত পুরস্কার। দেখতে দেখতে মেলার মাঠ ছাপিয়ে উঠল লোকে লোকে। দর্শকের ভিড়ে দিশেহারা হবার দশা। দর্শকদের মধ্যে শুধু বাঙালীরাই যে আছে তা নয়। সাহেব-সুবোও অগুন্তি। সেদিন যে সব বিখ্যাত সাহেব মেলায় উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক পেডলার সাহেব আর ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব সার জন স্ট্রাচি।

ব্যায়ামের আগে ঘরের ভিতর বক্তৃতা শুনছিলেন বিপিন পাল। ব্যায়াম দেখার জন্যে যখন বাইরের মাঠে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে রইল একখানা কাঠের চেয়ার। জমিয়ে-জাঁকিয়ে বসে নেওয়া যাক আগে। তারপর দেখা যাবে লাঠি ঘোরানো, তলোয়ারের খেলা, কুস্তি কসরৎ।

বিপিন পাল খেলা দেখতে তন্ময়। সেই সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল দুটি শ্বেতাঙ্গ। একজন হ্যাটকোটধারী সাহেব। অপরটি তার অর্ধাঙ্গিনী। বিপিন পাল একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন। তারা ইংরেজ কি ইউরেশিয়ান তা বুঝতে পারলেন না। বোঝার দরকারও নেই। দেখতে আসা খেলা, সাহেব-মেম নয়।

এই সময় হঠাৎ তাঁর পিছনে গর্জন করে উঠল পুরুষ্টু সাহেবের রুষ্ট কণ্ঠস্বর।

চেয়ারটা ছেড়ে দিন।

বিপিনচন্দ্রের কানে গেল কথাটা। কিন্তু কানে তুললেন না। আবার গর্জন। চেয়ারটা ছেড়ে দিতে হবে। যেহেতু সাহেবের সঙ্গে রয়েছে সম্মানিয়া লেডি। বিপিনচন্দ্র এমনং তন্ময়, যেন যোগাসনে বসেছেন। উঠে দাঁড়াবার নামগন্ধ তো নেই-ই।

সাহেব এতবড় অপমান সহ্য করতে না পেরে চেয়ার শুদ্ধ বিপিনচন্দ্রকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন উৎক্ষিপ্ত ক্রোধে।

"আমি তখন উঠিয়া চৌকিখানার সামনের পা দু'খানি শক্ত করিয়া ধরিলাম ও নীরবে চেয়ারখানিকে তাঁহার হাতছাড়া করিবার জন্য শরীরের সকল বল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। আমরা দুজনে চেয়ার লইয়া টানাটানি করিতেছি দেখিয়া দু একটি বাঙালী যুবক আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন সাহেবের হাতে প্রবল মুষ্ঠ্যাঘাত করিলেন। সাহেব তখন চেয়ার ছাড়িয়া দিযা ছেলেদের সঙ্গে ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিলেন। আমি তখন চেয়ারখানি লইয়া জনতার বাহিরে আসিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইলাম।"

ওদিকে তখন মারামারির পর্ব জমে উঠেছে পুরোদস্তুর। সাহেব বনাম বাঙালী, দেখতে দেখতে পুলিশ এসে হাজির।

চিৎপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন লাইন্যাম সাহেব। তিনি মেলাতে ছিলেন দর্শক হিসেবে। মারামারির গন্ধ নাকে যেতেই হনহনিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘটনাস্থলে। এসেই দেখলেন সাহেববাচ্চারা বেধড়ক মার খাচ্ছে নেটিভ বাঙালীর হাতে। তাদের বরতনু বর্বর আঘাতে জর্জরিত। সাহেব হয়ে জ্ঞাতি ভাইদের এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করার মত উদাসীন তিনি নন। সুতরাং—"তিনি সেখানে যাইয়াই সাহেবদের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং শুনিয়াছি যথাসাধ্য বাঙালীদিগকে মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করেন। বাঙালীরা তখন লাইন্যাম সাহেবকেও শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে কলিকাতার বাঙালী পড়ুয়ার দলে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার হাতে লাইন্যাম নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন ; শুনিয়াছি তিনি লাইন্যামের দুটা হাতে ধরিয়া কাঠুরিয়ারা যেমন করাত দিয়া কাঠ চিরে, সেইরূপভাবে একটি আমগাছে ঘষিয়াছিলেন।"

মারামারির আসল উপলক্ষ্য চলে গেছে দূরে। এবার শুরু হয়েছে পুলিশ বনাম জনতা। পুলিশ পক্ষ তাঁদের প্রভুর এই চরম অপমানের জবাব দিতে মরীয়া হয়ে উঠল।

কোমরে চাপরাশ। শক্ত মালকোচা আঁটা। খালি গা। দল বেঁধে বাগানে এসে দাঁড়াল হনুমন্ত সিং-এর চেলাচামুণ্ডারা। বাঙালীরা দেখলে প্রতিপক্ষ ক্রমশ হয়ে উঠছে শক্তিমান। এখন কি করা যায়? ছোঁড়ো ইট-পাটকেল। ইট-পাটকেলই বা কোথায়? বাগানের ফটকের কাছে তো কোথাও নেই! আছে কেবল সামনের ঐ পুকুর পাড়ে। তবে ওখানেই চলো। পুকুর পাড়ে ইটের ঢিপি। সেইখানেই গড়ে উঠলো তাদের ছিদ্রহীন ব্যূহ। পুলিশ পক্ষ পড়ল মুস্কিলে। ইটের বৃষ্টি ঠেলে তারা পুকুরের ওপারে যেতে অপারগ। এখন কেবল কোনমতে মাথা বাঁচিয়ে টিকে থাকা। শোনা যায়, সেদিনের খণ্ডযুদ্ধ এইভাবে চলেছিল সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা।

"শুনিয়াছি বলিতেছি এইজন্য যে আমি এই যুদ্ধের প্রথমেই পুলিশের হাতে বন্দী হই। আমা হইতেই মারামারির সূত্রপাত; মারামারির মূল কারণ চেয়ারখানি আমি হল্লার বাহিরে আসিয়াও প্রাণ দিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একজন পুলিশের জমাদার ও দুইজন কনষ্টেবল একটি যুবকের পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া বেদম মুষ্ঠ্যাঘাত করিতেছে। আমার মনে হইল যে ঐ যুবকটি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। আমি অমনি সেই চেয়ার লইয়া যাইয়া সেই জমাদার ও কনস্টেবলদের আক্রমণ করিলাম। তাহারা তখন সেই যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিল; আর এমনি আরও পাঁচ ছয়জন পুলিশ আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিল। যে যুবকটিকে পুলিশ মারিতেছে দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম সে সুন্দরীমোহন নহে। সুন্দরীমোহন তখন অন্যত্র

মারামারির বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ আমাকে ঘেরাও করিয়া মারিতেছে দেখিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া নিজের শরীর দিয়া আমার শরীরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপে আমরা দুজন সকলের আগে বন্দী হই। আমাদের দুজনকে যখন পুলিশ থানায় লইয়া যায়, তখনও দলে দলে হনুমান সিং-এর দল বদনচাঁদের বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার পরেই লড়াইটা ভাল করিয়া জমাট বাঁধে। কাজেই সকল ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখি নাই। লাইন্যামের লাঞ্ছনাও দেখি নাই; বাঙালী যুবকদিগের রণনীতিও দেখি নাই। কি করিয়া যে তাহারা বহুক্ষণ পর্যন্ত অব্যর্থ সন্ধান ইট ছুঁড়িয়া পুলিশের ফটককে ফটকের মুখে আটকাইয়া রাখিয়া ছিল, তাহাও দেখি নাই। এ সকল পরে শুনিয়াছি।”

শেষ পর্যন্ত সেদিনের সেই চেয়ারঘটিত খণ্ড যুদ্ধের প্রধান বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল চার। বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন তো ছিলেনই। বাকী দুজনের একজন হলেন নবগোপাল মিত্রের কুটুম্ব। তাঁর জামাইয়ের ভাই। হাওড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক।

বিচার শুরু হল বন্দীদের।

বিচারালয় শিয়ালদার পুলিশ আদালত।

বিচারক, শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর। তিনি তখন শিয়ালদার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট।

বিচারে শাস্তি পেলেন বিপিন পাল।

কুড়ি টাকা জরিমানা।

বিচার শেষ। হিন্দু মেলাও শেষ। আর মেলা বসেনি পরের বছর। এর পর বাঙালীর রাজনীতি অন্য পথে হাঁটা শুরু করেছিল। শুরু হয়েছিল প্রাণের অন্য উৎসব। স্বদেশীবোধের মন্ত্রে মাতাল অন্য মেলা। সেখানেও বিপিনচন্দ্র হাজির হয়েছেন সবার আগে।

তবে তাঁর ভূমিকা পালটিয়েছে। দর্শক রূপান্তরিত হয়েছে দ্রষ্টব্যে। মূক শ্রোতার জন্মান্তর ঘটেছে মুখর বক্তায়।

তখন আর তাঁকে কাঠের চেয়ার খুঁজে জোগাড় করে বুক আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয়নি। চেয়ার আপনিই এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে সসম্মানে।

সেদিন ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগের চিত্রগুপ্তের খাতায় তাঁর সম্বন্ধে যে গুপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিল, তা এইরকম—

"The chief of the itinerent demagogues was Bipin Chandra Paul who did more to inflame the minds of the masses against the Government than any one else."

অন্য দিকে বাঙালী ঐতিহাসিক বিনয় সরকারের শ্রদ্ধা নিবেদন হল—

"আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫ সনের আগস্ট হতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতিকে তাতিয়ে তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক বাংলার জন্ম হত না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লবযোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল। তার সঙ্গে গলার আওয়াজ জোরালো ছিল বলেই বিপিন পালের কীর্তি। একমাত্র গলাবাজি করে কেউ দেশ মাতাতে পারে না।"

বিপিন পালের কঠোর স্বদেশীয়ানা কাঠের চেয়ারে শুরু। স্বদেশবাসীর হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে শেষ।

বজ্র ও নিবেদিতা

"বজ্র যেন সর্বদা থাকে কালো মেঘেব পিছনে, যাতে আকাশের কোনখান থেকে তা নিক্ষিপ্ত হল, কেউ বুঝতে না পারে।"

এই কথা যাঁর লেখা তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। নাম জগদীশচন্দ্র বসু। যাঁকে লেখা তিনি একজন বিদেশিনী। ভারতবর্ষের মহিমাময় ঐতিহ্যে তিনি আকৃষ্টা। পরশাসিত ভারতবর্ষ বেঁচে উঠুক আত্মপ্রতিষ্ঠায়, আত্ম-বিকাশের মহান গৌরবে, তাঁর অক্লান্ত কর্ম-প্রচেষ্টার মর্মমূলে এইটিই নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। বিদেশিনীর নাম নিবেদিতা।

১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব।' উৎসবে ভাষণ দিতে উঠে লর্ড কার্জন কুটিল কটাক্ষ

হানলেন প্রাচ্যদেশের সভ্যতা বোধের ওপর। প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের লোকের কাছে সত্য অনেক বেশী সমাদৃত, মন্তব্য করলেন তিনি। অগণিত শিক্ষিত শ্রোতা অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করলেন কার্জন-মুখ-নিঃসৃত মন্তব্যের তীব্র তিক্ত রস। সভাস্থল প্রতিবাদহীন। সভা ভাঙলে দেখা গেল সেনেট হলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন মৃদু গুঞ্জনে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কার্জনের অসার অসত্য মন্তব্যের বিরুদ্ধে। সভাস্থলে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন নিবেদিতাও। সভা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন স্যার গুরুদাসের কাছে। চোখে মুখে জ্বলন্ত ক্রোধ। অপমানে তিনি আরক্তা। তাঁর এখুনি চাই কার্জনের নিজের কলমে লেখা-বই "প্রবলেমস অব দা ফার ইষ্ট।" এখনি তিনি জবাব দেবেন উদ্ধত শাসকের মিথ্যাচারের। স্যার গুরুদাসের চেষ্টায় সেই দিনই যোগাড় হল বই। বই ঘাঁটতেই বেরুল কার্জনের নিজের মিথ্যা ভাষণের মণ্ময় ইতিহাস। কোরিয়ার পররাষ্ট্র দফতরের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করার সময় নিজের চপল তেত্রিশকে প্রাজ্ঞ চল্লিশ বলে জাহির করেছিলেন তিনি নিঃসঙ্কোচে। প্রেসিডেণ্টের মনস্তুষ্টি বিধানে সেদিন ঐ মিথ্যা ভাষণ কার্জনের কাজে লেগেছিল। নিবেদিতা কার্জনকে ডোবাতে চাইলেন স্বখাত সলিলে। কার্জনের অস্ত্রেই কার্জন নিধন।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই সংবাদপত্রের মারফৎ সারা শহরের চোখের সামনে ফুটে উঠল নিবেদিতার প্রজ্বলন্ত প্রতিবাদ। দুদিন যেতে না যেতেই আরেক চিঠি। প্রথম চিঠি অমৃতবাজারে। দ্বিতীয় চিঠি স্টেটসম্যানে। একাই যোদ্ধা। যুদ্ধ শুধু কার্জনের বিরুদ্ধে নয়। যুদ্ধ তাঁদেরও বিরুদ্ধে যাঁরা অপূর্ব নিরবতায় সভাস্থলে বসে উপভোগ করেছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি উত্থাপিত অসত্য অভিযোগ।

নিবেদিতার চিঠিতে ঘুম ভাঙল কলকাতার। অনেকের মনের

মধ্যে বিক্ষোভ ছিল ছাই চাপা হয়ে। এবার ছাই গেল উড়ে। মার খাওয়া মুখের নীল শিরা দপদপিয়ে উঠল লাল রক্তের রোষে। তারপর অনেক সভা সমিতি। অনেক জ্বালামুখী ভাষণ। অনেক আন্দোলনের ঝড়। ঝড়টাকে হাঁকিয়ে তুলেছিলেন যিনি, সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু অজ্ঞাত ছিল তাঁর নাম। কারণ নিবেদিতার চিঠি দুটি ছাপা হয়েছিল বেনামীতে। কেবল শিক্ষিত সমাজের কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিই জানতেন চিঠির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কার কলমের। জানতেন কার কলমে সম্ভব এমন বিদ্যুৎ দীপ্তি। নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁরা সেদিন অবনত না হয়ে পারেননি। এবং সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের সূত্রেই নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের পত্র। 'বজ্র যেন সর্বদা থাকে কালো মেঘের পিছনে....'

নিবেদিতার মধ্যে জগদীশচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন বজ্র। বজ্রের মধ্যে নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের তপঃদীপ্ত অতীত, তেজোদীপ্ত ভবিষ্যৎ। এই বজ্র আবিষ্কারের কাহিনী অপূর্ব। নিবেদিতার বজ্র আবিষ্কার বুদ্ধগয়ায়।

তাঁর সেবারের, ১৯০৪, বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ, ক্রিষ্টিন, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি। মহান্তের অতিথি তাঁরা। অবসর যাপনের ফাঁকগুলো ভরে ওঠে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে, গানে। অন্য সময় আলোচনা চলে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে, বুদ্ধের করুণা ও নির্বাণ বিষয়ে। নিবেদিতা স্বকণ্ঠে পাঠ করে শোনান ওয়ারেনের "বৌদ্ধধর্ম", কিংবা কোন দিন এডউইন আর্ণল্ডের "লাইট অব এশিয়া"। পাঠের পর আলোচনা। পাঠান্তে ভ্রমণ। কাছের দূরের গ্রাম দেখে বেড়ানো। কোথাও কোন পাঁজর বেরুনো ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বোবা ইতিহাসের মনের কথা শোনা। কোথাও একটুখানি সুন্দর স্থাপত্য, কোথায় এক টুকরো ভাস্কর্যের নমুনা, নিবেদিতা তারই দিকে চেয়ে যেন হারিয়ে যান জন্ম-জন্মান্তরের পারে। নামে গোধূলি। নীরব

হয়ে আসে বনতল। আকাশ জুড়ে গেরুয়া আলোর উত্তরীয় বিছিয়ে সূর্যদেব যেন অন্তর্হিত হন তাঁর নিভৃত ধ্যানের জগতে। গভীর ধ্যানের মত নির্মল স্তব্ধতা নেমে আসে বোধিদ্রুমতলে। জাপানী এক ধীবর মন্ত্র পাঠের সুরে মৃদুকণ্ঠে গান গায় "নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়", তাতে স্তব্ধতা হয়ে ওঠে অন্তর্ভেদী। চেতনার ভিতরে শুরু হয় নিঃশব্দ জাগরণ। এমনি আত্মহারা মুহূর্তে নিবেদিতা হয়তো ধর্ম বিষয়ে কোন গভীর অনুভূতির কথা প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুভূতির শিহরণকে আরো অন্তর্ভেদী করে তুললেন, হয়তো একটি ভজন গেয়ে। এইভাবে কাটে বুদ্ধগয়ার শান্ত-সুন্দর সৌম্য দিনগুলি।

তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন নিবেদিতা আবিষ্কার করলেন বজ্র। চোখে পড়ল অপরূপ এক দৃশ্য। বিরাট গোলাকার পাথরের চারদিকে অগণিত বজ্র চিহ্ন। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে বজ্র-চিহ্নিত এই আসন বুদ্ধের সত্য সাধনার বেদীরূপে ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত। নিবেদিতা স্তব্ধ হয়ে দেখলেন। বাইরে স্তব্ধতা। ভিতরে রক্তস্রোতে আলোড়ন। এই চিহ্নই যেন তিনি খুঁজছিলেন জীবন ধরে। এই শক্তির প্রতীককে, ত্যাগের প্রতীককে আজ যেন তাঁর বেশী প্রয়োজন। নিবেদিতা পাথরে আঁকা বজ্রকে তুলে নিলেন নিজের বুকে, নিজের অস্থি-মজ্জায়-রক্তে, নিজের স্বপ্নে।

"যখন কেউ মানব জাতির মঙ্গল সাধনে নিজেকে নিবেদিত করে, তখন তিনি দেবতার হাতের বজ্রের মত শক্তিময়"—এই বলে বজ্রকে তিনি স্থাপন করলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের পাদপীঠে। তাঁর চোখে ভেসে উঠল ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি। ১৯০৬-এ কলকাতায় বসেছে কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রীরা গড়তে বসল জাতীয় পতাকা। প্রগাঢ় রক্তিম কাপড়ের পট-ভূমিকায় সোনালী সুতোয় বোনা হতে লাগল বজ্র চিহ্ন। বজ্রের দুপাশে লেখা হল "বন্দেমাতরম", কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেল সে পতাকা।

আকাশে বজ্র-নন্দিত পতাকা উড়িয়েও তৃপ্তি নেই। কেন বজ্র জাতীয় পতাকায় অপরিহার্য, তা নিয়ে চলল গবেষণা। ১৯০৯-এর মডার্ণ রিভিউএ বেরুল তাঁর সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ।

"দেবতারা খুঁজছিলেন একটা চরম দৈবাস্ত্র। তাঁরা জানলেন যে. যদি এমন কোন মানুষ পাওয়া যায়, যিনি স্বেচ্ছায় দান করবেন নিজের অস্থি, তবেই সৃষ্টি হয় অমোঘ সেই দৈবাস্ত্র। এই ভেবে দেবতার দল একদা উপস্থিত হলেন ঋষি দধীচির কাছে। জানালেন প্রার্থনা। বিরাট ঠাট্টার মত শোনাল তাঁদের আকৃতি। মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে অনেক কিছুই। কিন্তু তাই বলে শরীর ত্যাগ! যতই প্রয়োজন পড়ুক না কেন ইন্দ্রকে রক্ষা করার। কিন্তু ঋষি দধীচির কাছে এও কোন অসম্ভব ত্যাগ নয়। দেবতাদের প্রার্থনা শুনলেন সহাস্যে। প্রাণ ত্যাগ করলেন সানন্দে। পড়ে রইল তাঁর দেহ, মানবতার প্রয়োজনে ঋষির মহান দান!

এর মধ্যেই রয়েছে বজ্রের তাৎপর্য। স্বার্থহীন মানুষই বজ্র।"

নিবেদিতার ব্যাকুল বাসনা, বিপুল আগ্রহ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় পতাকায় বজ্র ঠাঁই পায়নি। তাবলে কি তাঁর স্বপ্নের বজ্র কোথাও নেই? আছে। আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে আছে। নিবেদিতার হাত থেকে তাঁর প্রিয় বজ্রকে গ্রহণ করলেন জগদীশচন্দ্র। বজ্রকে তার সম্মানের আসন পেতে দিলেন নিজের বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষদেশে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে বললেন—

"পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাহারা পরার্থে জীবন দান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।"

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের আত্মিক সম্পর্ক বজ্রের মত বাঁধনে বাঁধা। সুদীর্ঘ পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহচর্য, সত্য প্রতিষ্ঠার তপস্যা

তাঁদের দুজনকে এক করেছিল বজ্রের শক্তিতে। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে ডাকতেন 'খোকা' বলে। ১৯০৫-এ ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন—"গতকাল ছিল খোকার জন্মদিন। সেই দিনটিকে বলি 'বজ্র দিন'। কারণ তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি ঐ দিনে। এখন সে মুক্ত....আরও বলি, আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে নিয়েছি। ফরাসীরা যেমন নেপোলিয়ানকে বলে L' homme, তাঁকে ইঙ্গিত করার জন্যে আর কোন কথার দরকার হয় না, তেমনি প্রাচীনকালে বুদ্ধের নাম লেখার পরিবর্তে বজ্র বললেই চলত। এ বিষয়ে আরো অনেক গভীর কথা আছে, যা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নানা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে যখন স্বামিজী নিজের সম্বন্ধে বজ্র কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।"

বজ্রই বারবার ওলোট-পালোট করে দিয়েছে নিবেদিতার জীবনকে। তখনো তিনি নিবেদিতা হননি। তখনো তিনি আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে মার্গারেট নোবল। তখনো ভারতবর্ষের মাটি চোখের সুদূর স্বপ্ন। সেই সময়েই কানে বেজেছিল এক বজ্র কণ্ঠের আহ্বান—"ভারতবর্ষে হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য যোঝেন তাদের পথ দেখিয়ে দেন, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে।"

"পুরুষ নয়, সিংহিনীর মত শক্তিমতী শক্তিময়ী একটি নারী চাই।"

নিবেদিতা সাড়া দিয়েছিলেন বজ্র আহ্বানে। এসে দাঁড়িয়েছিলেন বজ্রের পাশে। বজ্র তাঁর প্রেরণা। বজ্রই তাঁর গুরু। বজ্রই ধ্যান। বজ্রই চোখের আকাশ, আকাশের অম্লান ধ্রুবতারা।

কিপলিং-এর শৃগাল ও সরলাদেবী

—আপনি কিপলিং-এর ঠিকানা জানেন ?

—কিপলিং ? কিপলিং-এর ঠিকানায় তোমার কি দরকার ?

—একটা চিঠি পাঠাবো।

—চিঠি ? কিপলিংকে ? কেন ?

—আপনি বোধ হয় পড়েন নি। আমি সম্প্রতি ওঁর একটা গল্প পড়লুম। তাতে এত জঘন্যভাবে, প্রায় ইতরের মত, একটা বাঙালী চরিত্র আঁকা হয়েছে যে পড়তে পড়তে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই একটা চিঠি লিখেছি তাঁকে। কিন্তু ঠিকানা জানি না বলে পাঠাতে পারছি না।

—কি লিখেছে গল্পে ?

—শুনবেন ? তাহ'লে বলছি। ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে পাঠান মুলুকের ডেপুটি কমিশনার হলেন একজন বাঙালী আই. সি. এস সাহেব। বেশ দিন কাটছিল তাঁর। বহাল তবিয়তেই। হঠাৎ একদিন পাঠানরা বিদ্রোহ করে বসল। খুন-খারাপী, লুটতরাজ, অরাজকতা বন্যার জলের মত ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ল মুলুক জুড়ে। ঐ বাঙালী আই.সি. এস সাহেবের কাঁধে চাপানো ছিল সারা জেলার শাসনের ভার। যারা উৎপীড়িত, নিগৃহীত, নিগাতীত তারা ভাবলে ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাদের বাঁচানোর জন্যে দুষ্কৃতিকে দমন করবেন দুহাতে, দশহাতে। কিন্তু দশ হাত কেন গোটা দেশের চতুঃসীমার মধ্যে কোথাও তাঁর টিকির নাগালটি পর্যন্ত নেই। চারদিক তোলপাড়। কিন্তু সাহেব নিখোঁজ। যিনি পালক তিনিই পলাতক। খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে একদিন শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হলেন তিনি। বনে জঙ্গলে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে। পাঠানদের দেখে ভয়ে তাঁর গায়ের রক্ত স্যাঁতা, চোখের চাউনি মরা। হাতে-পায়ে কাঁপুনী। একটি কম্পমান কাপুরুষ।

পাঠানরা তাঁকে হাতের নাগালে পেয়ে ঘাড়ে বসালে খাঁড়ার এক কোপ। ধড় থেকে মুণ্ডুটা খসে পড়ল পাকা আমের মত। তারপর সেই কাটা মুণ্ডুটাকে একটা শূলের উপর গেঁথে তারা শহর জুড়ে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল—গ্যাখ, গ্যাখ, 'বাঙালী গিদ্দর' অর্থাৎ বাঙালী শৃগালের চেহারা গ্যাখ।

গল্প শেষ। সরলাদেবী থামলেন। চোখ মুখ রাগের আগুনে রাঙা।

গল্প শুনে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন উড়িষ্যার মধুসূদন দাস। দেশপ্রেমিক প্রাণ। বাঙলাকে ভালবাসেন। বাঙালী স্বভাব। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর তিনি বললেন—

—কি লিখেছো চিঠিতে ?

—চিঠিতে যা লিখেছি, তার মর্মকথা হোল, "আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত করেছ, সে কলঙ্ক ঘোচানোর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভায়েদের একজন কারও সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। পাঁচ বছর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক তলোয়ার হোক, যে কোন অস্ত্র তুমি ইচ্ছে কর, নিজেকে তাতেই অভ্যস্থ করে নাও—আজ হতে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।"

—সর্বনাশ। ডুয়েল।

—হ্যাঁ। ডুয়েল। এ ছাড়া আর কি পথ আছে ঐ ভারত-নিন্দুক বাঙালী-বিদ্বেষীটিকে উচিত শিক্ষা দেবার ?

—আছে। চিঠি পাঠানো বন্ধ করা। কিপলিংকে যে পাঁচ বছর সময় দিয়েছ, সেই পাঁচ বছর বাঙালী ছেলেদের তৈরী করে নাও, শৌর্যে বীর্যে, অস্ত্রচালনায়। লাঠি খেলুক। ছাতি ফলুক। শিরদাঁড়া সোজা হোক। তারপর challenge পাঠাও কিপলিংকে। তখন লড়াইটা জমবে। বোধোদয় ঘটবে, গিদ্দরের গায়ে সিংহের তাগদ্ দেখে। আমার মনে হয় সেইটেই সঙ্গত।

মধুসূদনের মন্তব্যই শিরোধার্য। কটকের কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরেই সরলা দেবী ঠিক করলেন ব্যায়ামের ক্লাব খুলবেন নিজের বাড়িতে, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে। সরলা দেবীর বাড়ি তখন ২৬নং সার্কুলার রোড়ে। বাড়ির মধ্যে লন। বাড়ির পিছনে পুকুর পাড়ে চৌকো জায়গা। এইখানে শুরু করা যাক। কিন্তু শেখাবে কে ? গুরু কই ?

গুরু আছে। শ্রীরামপুরের উকীল মহেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ির ছেলেরা খবর দিলে, আমাদের গুরুই আপনাদের গুরু হোক না। প্রফেসর মাতার্জা।

গুরু ঠিক। অমনি সমিতিও শুরু।

"তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে উঠে ২৬নং সার্কুলার রোডে এসেছি। এ বাড়িতে সামনে একটা বড় Lawn আছে। আর পিছন দিকে পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনো জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানা রকম অস্ত্র শিক্ষা করে। ক্লাবের সব খরচ, মার্তাজার মাইনে, বক্সিংয়ের দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি ও ছোট লাঠি প্রভৃতি সবেরই খরচ আমি দিই। ভবানী-পুরের ছেলেরা আসে, শেখে। আমি বসে থাকি চেয়ারে একপাশে, সামনে টেবিল পেতে একটা খাতায় প্রতিদিন ছেলেদের হাজরি লিখি। ক্রমে ক্রমে এই ক্লাবের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দূর দূর থেকেও ছেলেরা আসতে লাগল এবং কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এই রকম ক্লাব খুলে গেল। পুলিন দাস এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতির' সর্দার হয়ে। অধিকাংশ ক্লাবই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেত, জিনিসে বা টাকায়। 'অনুশীলন সমিতি'ও পেত এবং সব ক্লাবেরাই যে যখন পারে এক একবার করে মার্তাজাকে শিক্ষক করে নিয়ে যেতে লাগল।"

নামেই সরলা। কাজে-কর্মে ভাবে-ভাবনায় ছেলেবেলা থেকেই বাঁকা পথে হাঁটবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল। সংস্কৃতে এম. এ. পড়তে পড়তেই পাড়ি দিয়েছিলেন মহীশূরে, সে সময়ে অভিজাত ঘরের মেয়েরা স্বাধীন জীবিকার কথা ঘুমের স্বপ্নেও চিন্তা করতে সাহস পায় নি। সকলের মনে সন্দেহ, সরলা কি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক? সরলা দেবী যেদিন মহীশূরের মহারাণী গার্লস্কুলের চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়বার আগে মহর্ষির কাছে আশীর্বাদ নিতে গেলেন, মহর্ষি সেদিন তাঁর বড় মেয়ে সৌদামিনীকে ডেকে গোপনে মন্তব্য করেছিলেন—

'সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না, তাহলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই যাবার আগে।'

এ কি মহর্ষির কৌতুক! নাতনীর উদ্দেশ্যে নিছক রহস্যালাপ? -নাকি নাতনীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি এ তাঁর অনিবার্য দৈববাণী?

সরলা দেবী বিয়ে করেছিলেন সত্যি, কিন্তু সংসারের তিনি কেউ নন। তাঁর দিন কাটেনি স্বামীর সংসারে ঘোমটা-টানা-বৌ সেজে। নিভৃত গৃহকোণের নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা নয়, তাঁর জীবন ঝড়-জাগানো রাতের অন্ধকার দিগন্তে রাঙা আলোর মশাল। এক গভীর অর্থে তলোয়ারের সঙ্গেই তাঁর আত্মার, আদর্শের, আপোসহীন বিপ্লব-সাধনার বিয়ে।

মহীশূর যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনটি যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। মহীশূর-ফেরার পর থেকেই সরলা দেবী কোষমুক্ত তরবারি।

"বড় মামার হাতে আরম্ভে রবিমামা ভারতীর যে বীণাকে আবাহন করলেন—

শুধাই ঐ গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজে না কেন?

তার প্রায় পঁচিশোর্ধ্বে কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরার পর আমার অঙ্গুলীর প্রথম সঞ্চালনে ভারতীর সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল। শঙ্করের ভেরী নাদিত করে লেখনী আমার বাঙালীকে 'মৃত্যুচর্চায়' আহ্বান করলে। এবার আমার হাতের প্রথম প্রবন্ধই হল তাই। সেই আমার বীণার প্রথম ঝঙ্কার। যে বাঙালী পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে বললে—মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলায় ধূলায়, আমোদে-প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, বিজ্ঞানে-সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক উদ্ধারে, জলেতে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলী সঞ্চারণে নয়। পাড়ি দাও সমুদ্রে; চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গে এভারেস্ট

শৃঙ্গে, সেকালের ভারতীয় সন্ন্যাসী পর্যটকদের লোটা-কম্বল-মাত্র সহায় হয়ে কিংবা একালের শ্বেতপুঙ্গবদের অনেক তোড়জোড়ে মধ্যে প্রধান যেটি সেইটি সম্বল করে—সুস্থ ও সবল শরীর। মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি সেইটি—বলিষ্ঠ ও সুস্থ শরীর। সেজন্যে চাই বাঙালীর ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা। এই হল আমার রুদ্রবীণের দ্বিতীয় ঝঙ্কার।

ডমরুতে একটা ঘা দিয়ে রুদ্রের বীণা বাজল তৃতীয় তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমার হাতে—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' এই রাগে। ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম—রেলেতে স্টীমারে, পথে ঘাটে, যেখানে যেখানে গোরা-সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁহাদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকোন আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। কোথা দিয়ে কোন্ হাওয়া বইছে, হঠাৎ যেন কেউ ঠাওর করে উঠতে পারে না। সে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরাবতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তন-ভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে—ইচ্ছে করুক আর নাই করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে—বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না, অনেকেই যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটা রাখি বেঁধে দিতুম; তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা Badge. হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপক্ষ

বরণ স্বীকার করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি আমার হাতে এ রাখি গ্রহণ মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্য বিপদ বরণের স্বীকৃতি। আমার রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়, তবু সংকল্প মনে মনে রাখলেই উদ্‌যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান ছিল।"

—আপনাকে আমাদের সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে সভানেত্রী হতে হবে।

—আমাকে? না ভাই, ও আমি পারবো না।

—দেখুন, আপনি নতুন জোয়ার এনেছেন বাঙলা দেশে, সাহসের শৌর্যের। আপনার মুখ থেকে কিছু শুনবো, শুনে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়াতে শিখবো সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা।

অনুরোধ যার, তিনি সরলদেবীর সমিতিরই ছেলে। তার উপর তখনকার নামজাদা পত্রিকা Dawn এর সম্পাদক বিখ্যাত সতীশ মুখুয্যের ভাগনে। নাম মণিলাল গাঙ্গুলী। শরীর চর্চা করেন, কিন্তু সাহিত্য-চর্চাতেও বড় আগ্রহী। বারংবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সরলা দেবী সম্মত। কিন্তু একটা সর্তে।

—"তোমাদের সভার সভানেত্রীত্ব করতে যাব—এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর আর দিনটা পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক একটি বিষয়ে এক একটি মেডেল দেব। একটি মাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট নয়— প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও—পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়।"

মণিলাল রাজী। সঙ্গে সঙ্গে বেরোল ছেলে খুঁজতে। খুঁজতে

খুঁজতে জুটে গেল হরদয়াল। রাজপুত ছেলে কিন্তু বনে গেছে বাঙালী। সে দেখাবে তলোয়ারের খেলা। মসজিদ বাড়ির ছেলেরা ছুটে এল, কুস্তির খেলা দেখাতে। ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেনবাবুর ছেলে ছোকরারা এল বক্সিং দেখাতে। সভা হয়ে উঠল জমজমাট। সভারম্ভে পাঠ করা হল মণিলালের লেখা সঙ্কিপ্ত প্রতাপাদিত্য-জীবনী। সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ।

কাগজে কাগজে ধন্য ধন্য রব।

তারপরই 'বীরাষ্টমী' ব্রতের উদ্‌যাপন। অনেকদিন থেকে চলেছিল এই রকম একটা ব্রতের অন্বেষণ। মুসলমানদের আছে মহরম। সবাই সেদিন মেলে এক যোগে। পথে ঘাটে খেলা দেখায় অস্ত্র-শস্ত্রের।

অন্যত্র হিন্দুদের আছে দশেরা বা রাসলীলা। উৎসবের সঙ্গে বলবীর্যের প্রদর্শনী। আমাদেরও তেমনি একটা জাতীয় উৎসবের দিন চাই। শুধু বাজনা-বাদ্যি নয়। শুধু নতুন জামা কাপড় নয়। শুধু বাজী পোড়ানো আর আলো জ্বালা নয়। তার সঙ্গে চাই শক্তির সাধনা। বীরোচিত অনুষ্ঠান। যে শারদীয় ঋতুতে পাণ্ডবরা অজ্ঞাত-বাস কাটিয়ে শমীবৃক্ষ থেকে লুকানো অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে বেরিয়েছিল ধর্মযুদ্ধে, সেই ঋতুতেই বাংলাদেশে এমন একটা জাতীয় উৎসব গড়ে তুলতে হবে, যেদিন প্রাণে প্রাণে মিলিত হবে সারা দেশ, কেবল জননীর সন্তান হিসেবে নয়, জন্মভূমির বীর সৈনিক হিসেবে।

"হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গা পূজার ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গাপূজার অষ্টমীর আর একটি নাম "বীরাষ্টমী"। এবং সেদিন 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালন করা ও ব্রত কথা শোনানর বিধান। আমার আর নতুন করে কোন দিন উদ্‌ভাবন করতে হল না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাঙলা দেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা।

বাঙালী মায়েদের বীর মাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা।········

সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড়ের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা-প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতায় যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল—তাঁরা যেন উৎসবে যোগদান করেন ও খেলার প্রতিযোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের Dowager নবাব বেগম সাহেবের কন্যা সুজাতালি বেগের পত্নী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পর্দা ঘেরা একটা প্লাটফর্মের ভিতর আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে শেষে পরদার ভিতর থেকে বাড়ান তাঁর হাত দিয়ে উৎসব-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম—কাউকে মুষ্টিযুদ্ধের জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি, এবং প্রত্যেকেই একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক'—তার এক পিঠে লেখা 'বীরোভব'—এক পিঠে দৈবাঃ দুর্বলঘাতকা।"

এইখানেই শেষ নয়, উদ্যমের উদ্যোগের। ছেদ নয় কল্পনার স্বপ্নের। তাঁর পায়ে চলার পথ ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়ানো, গেছে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবে, লাহোরে, কাশীতে, বরোদায়, দূর দূরান্তে। তাঁর স্বপ্ন-রঙীন স্বদেশী-সাধনাও কোথা থেকে দুটো শক্ত ডানায় ভর দিয়ে গর্বিত গরুড়ের মত পাড়ি দিয়েছে কর্মজীবনের বিপুল আকাশ জুড়ে। যে-বন্দেমাতরম্ গানে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সুর বসিয়েছিলেন, তিনি নিজেই যেন সেই গানের দশপ্রহরণধারিণী, অসি-তে মসিতে সমান পারদর্শিনী।

তাঁর গোটা জীবনটাকে, দেবতার পায়ে ফুলের মত, দেশের বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শুধু উত্তপ্ত, উজ্জ্বল একটি বাসনায়। কিপলিং-এর কলমের শৃগালদের সিংহ বানিয়ে, কিপলিং-এর দেশের সিংহচর্মাবৃত শৃগালদের ভারত-ছাড়া করতে। সরলাদেবী ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলনের আদি জননী।

গুপ্তসমিতি, গুপ্তপ্রেম ও যতীন্দ্রনাথ

—তুমি বাঙালী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি নাম তোমার ?

—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এখানে এসেছ কেন ?

—আজ্ঞে সৈনিকের চাকরি খুঁজতে।

—সৈনিক ? তুমি কি সৈন্যদলে ঢুকতে চাও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চাকরি পেলে না ?

—আজ্ঞে না। বাঙালীকে ইংরেজরা সৈনিকের চাকরি দিতে

চায় না। কারণ বাঙালী নাকি ভীরু। ইংরেজরা তো পাত্তা দেবে না। আমি ভেবেছিলাম মিত্র বা করদ রাজ্যে ঘুরে দেখি, যদি কপাল খোলে। সেখানে দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ইংরেজ প্রভুরা চটতে পারেন এই আতংকে বাঙালীর নাম শুনলেই তাদের কানে তুলো।

শুনতে শুনতে ভারতপুরের বাঙালী মঠের মহান্ত ভালবেসে ফেললেন যতীন্দ্রনাথকে। সত্যিই বীর সৈনিক হবার মত গড়নটি বটে শরীরের। শালপ্রাংশু, বৃষস্কন্দ, আজানুলম্বিত বাহু, কপাট বক্ষ। চোখে অগ্নি, বাহুতে বজ্র, যেন এক সুকঠিন প্রতিজ্ঞার মত সবল সতেজ প্রাণ।

মোহান্ত ভালবেসে ফেললেন যুবকটিকে। একদিন কানে কানে পরামর্শ দিলেন একটা।

—শোন। এখানে কালক্ষয় করে কোন লাভ হবে না। সটান চলে যাও বরোদায়। বরোদার মহারাজের খাস সচীব হলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। মহারাজা তাঁর পরামর্শ মানেন। কখনো তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করেন না। তিনি যদি তোমাকে সাহায্য করেন, তাহলে তোমার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হবার একটা সম্ভাবনা পেয়ে যেতে পারে। তাঁর মনোযোগই তোমার মনস্কামকে পারে পূর্ণ করতে। তবে একটা কথা। সর্বদা সত্য কথা বলবে। কিন্তু ভুলেও নিজেকে সেখানে বাঙালী বলে পরিচয় দিও না। তুমি তো হিন্দী বলতে পার চমৎকার। সুতরাং আত্মগোপনের পথ তোমার কণ্টকহীন।

একদিন সত্যিসত্যিই ভারতপুর থেকে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় এসে হাজির। এবং অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

—তুমি বাঙালী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি নাম তোমার ?

—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বরোদায় সবাইকে বলেছি যতীন্দর উপাধ্যায়।

—সৈন্যদলে চাকরি চাও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

—আচ্ছা, দেখছি।

যতীন্দ্রনাথের জন্য চাকরি দেখার আগে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে দেখলেন। সেই মুহূর্তে যতীন্দ্রনাথের চোখে কী গহন আলো ফুটেছিল কে জানে। অরবিন্দের বুকে কী গভীর স্বপ্ন ফুটেছিল কে জানে। দুজনে দুজনকে দেখলেন। ইতিহাসের দেবতা এই দুটি অপরিচিত প্রাণকে এক ক্ষেত্রে মেলালেন সেদিন, এক রণক্ষেত্রের দুই সৈনিক করে গড়বেন বলে।

বরোদার সেনাবাহিনীর হোমরা-চোমরারা অরবিন্দের বন্ধুস্থানীয়। সুতরাং যতীন্দর উপাধ্যায়ের কপাল খুলতে বেশী কাঠখড় পোড়াতে হল না। যে সুযোগ হাতে এসেছিল পয়লা দফাতেই, তাতে এক লাফে অনেক উঁচু ডালে ওঠা যেতো। যতীন্দর সেদিকে হাত বাড়ালেন না। তিনি নিলেন সামান্য পদাতিক সৈন্যের চাকরি। তিনি চাইলেন একেবারে গোড়া থেকে সেনাবাহিনীর গোটা ব্যাপারটা বুঝতে। কত ধানে কত চাল ; কেমন সৈন্য, কেমন ঢাল, যুদ্ধ চালাবার ফন্দী-ফিকির ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব জানবার জন্যই তো ওৎ পেতে থাকা। এখানে শুধু অস্ত্র চালনার ধরন শিখতে আসা। তারপর যেদিন আসবে শুভলগ্ন, সুপ্রভাতের রৌদ্র রুদ্র তেজে উঠবে জ্বলে, সেদিন শুরু হবে অস্ত্রধারণের পালা। আজ রক্তের কোষে কোষে পরাধীনতার জ্বালা। সেদিন হাতে জ্বলে উঠবে স্বাধীনতা যুদ্ধের কোষমুক্ত তরবারী। দিন আগত ঐ।

বর্ধমানের ছেলে যতীন্দ্রনাথ। বয়স্ক হতেই বুকে ক্রমবর্ধমান স্বপ্ন, সৈনিক হতে হবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন এলাহাবাদে, আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে পরিচয় এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শিক্ষিত মহলে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। মানুষ হিসেবে মহৎ। চরিত্র শুধু সরল নয়,

সবল। রামানন্দবাবু কি করে যেন টের পেয়ে গেলেন যতীন্দ্রনাথের পকেটে সম্বল নেই কিন্তু মনে সাধ এফ. এ পড়বে। তিনি যতীন্দ্রনাথকে নিজের কলেজে নিলেন ভর্তি করে। আর সেই সঙ্গে তাকে পাইয়ে দিলেন একটা গৃহশিক্ষকের চাকরি। বাইরে দূরে নয়, একেবারে নিজের সংসারে। তাঁরই ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক।

এই রামানন্দবাবুর কাছ থেকেই তার প্রথম স্বদেশী-দীক্ষা। তাঁর মুখ থেকেই ক্রমাগত শোনা পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাস, খণ্ড ইতালীর অখণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রাম কি ভাবে জন্ম নিল। কি করে ব্যর্থ হল ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহ। আনন্দমঠ পড়া ছিল আগে। ম্যাটাসিনি, গ্যারিবল্ডির মূর্তি গড়া ছিল মনের গোপন চোরা-কুঠরীতে। জমি তৈরী ছিল। তাতে জমলো সার। এলাহাবাদের যতীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

উপক্রমণিকা বরোদায়।

কব্জিতে জোর। কলজেয় সাহস। মগজে বুদ্ধি। মনে দুঃসাহস। বরোদায় যতীন্দর-এর পদোন্নতি ছাড়ায় কে? পদাতিক থেকে লাফ দিয়ে ঘোড়-সওয়ার, ঘোড়-সওয়ার থেকে ঘাড় উঁচিয়ে বরোদার মহারাজার শরীর-রক্ষক। কিন্তু তারপর?

'বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার'-এর রচয়িতা ক্ষীরোদকুমার দত্ত এখানে তাঁর পরবর্তী অধ্যায়ের কথক।

"সৈনিক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলেন। ক্রমে তিনি মহারাজার শরীররক্ষক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এর অল্প দিন পরে আড়াইয়া গ্রামের অন্য এক ব্যক্তি মহারাজের সৈন্যদলে প্রবেশ করতে গেলে, যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁকে কর্মে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হল। যতীন্দ্রনাথের বাঙালী পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ঘোষ সাহেবকে (অরবিন্দকে) ডেকে সব বলা হল। তখনই তিনি যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দিলেন। যতীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ আলোচনায়ই অরবিন্দের অন্তরের স্বভাবতঃ মৌন

বৈপ্লবিক সংগঠন কর্মী পথের সন্ধান পেল। অরবিন্দের ভাবী বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত হল এখানে।"

১৯০২।

অরবিন্দের লেখা একটা চিঠি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ একদিন এসে উপস্থিত কলকাতায়, সরলা দেবীর কাছে। সরলা দেবীর নেতৃত্বে কলকাতায় তখন 'লাঠি-কাল্টে'র জোয়ার। ব্যারিস্টার পি. মিত্র সরলা দেবীর সহযোগী। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় পি. মিত্রের কাজ তখন 'ডিমে তা দেওয়া'। অর্থাৎ কাঁচা প্রাণকে জাগানোর কাজ। সবুজকে অগ্নিময় করে তোলা।

সরলা দেবী আর পি. মিত্রের সহযোগিতায় কলকাতায় গড়ে উঠল বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। সভাপতি পি. মিত্র। সহ সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও ঋষি অরবিন্দ। কোষাধ্যক্ষ সুরেন ঠাকুর। আর সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন। তখনো বারীন ঘোষ বরোদায়। পরে বারীন ঘোষ এসে সমিতিতে যোগ দিলে তিনি হন যুক্ত সম্পাদক।

সুকিয়া স্ট্রীট থানার গায়ে ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোড। এটাই হল যতীন্দ্রনাথের আস্তানা। বাড়িটা ছিল বড়ই। সামনে খোলা মাঠ, রাস্তার দিকের অংশটা একতলা। উঠোন পেরোলেই অন্দরমহল। দোতলা। এখানেই থাকতেন যতীন্দ্রনাথ, সঙ্গে স্ত্রী ও এক বোন। এখানেও খোলা হল একটা ছোট্ট সমিতি। যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব। এখানে শেখানো হত ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চড়া, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি খেলা, আরও সব। যতীন্দ্রনাথ অন্যদের উৎসাহিত করার জন্যে নিজে সামরিক বেশে ঘোড়ায় চেপে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করতেন। এসব ছাড়াও ছিল রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্যে পাঠচক্র আর বক্তৃতার আয়োজন। নিবেদিতা দান করেছিলেন একরাশ বই। তার মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, খণ্ড-বিখণ্ড

ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী, টডের রাজস্থান, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরজীর অর্থনীতির বই, জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরার বই।

সমিতির আয়-ব্যয়ের জন্যে যতীন্দ্রনাথের মাথাব্যথা নেই। তার জন্যে পি. মিত্র। নিজে ব্যারিস্টার। সহকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে আড়াই শো তিনি একাই জোগাড় করে দিতেন মাসে মাসে। তা ছাড়া নিজে দিতেন ত্রিশ টাকা।

১৯০৩।

বরোদা থেকে বারীন ঘোষ চলে এলেন কলকাতায়। অরবিন্দের নির্দেশে। অরবিন্দের হাতে বিপ্লবে দীক্ষা নিয়ে। এর কিছুকাল আগে অরবিন্দ নিজে দীক্ষা নিয়েছেন বিপ্লব সমিতির। বারীন্দ্রর কথায়—

"আমি তখন বরোদায়। একদিন একজন যোদ্ধৃবেশধারী দীর্ঘকায় পুরুষ অশ্বারোহণে খাসিরাও যাদবের বাড়ীতে এসে হাজির। তাকে সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে গিয়ে অরবিন্দ নিভৃত দুয়ার দিলেন। আধঘণ্টা পর সেই রহস্যজনক মানুষটি বাহিরে এসে অরবিন্দের কাছে বিদায় নিয়ে চলিয়া গেলেন; কোমরে তাঁর কোষবদ্ধ অসি লম্বমান। আমি ইতিপূর্বে জানতাম, অরবিন্দ গুপ্ত সমিতিতে সংযুক্ত আছেন এবং শীঘ্র তার যথারীতি দীক্ষা হবে। আজকার ঘটনায় আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ব্যাপারই আজ তার দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হলো। এর ছয় মাস পরে অরবিন্দ নিজে আমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান। তার মর্ম হচ্ছে —দেহে যতদিন জীবন আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটে, ততদিন এই বিপ্লব মন্ত্র পালন করে যাব। যদি কখন এই গুপ্ত সমিতির কোন কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি তাহলে চক্রের গুপ্ত ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে।"

দীক্ষা শেষ হতেই অরবিন্দ বললেন—বারীন্দ্র, কলকাতায় যাও। যতীন্দ্র একা পারবে না। তাকে সাহায্য করবে কলকাতায় গুপ্ত সমিতি গড়তে।

"অরবিন্দের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ষাট-সত্তর টাকার নোট পকেটে গুঁজে, একটা ছোট্ট বিছানা ও ক্যানভাসের ব্যাগ হাতে আমি একদিন সুপ্রভাতে যাত্রা করলাম আমার আরাধ্যা শ্যামা বঙ্গভূমির উদ্দেশ্যে। সে হচ্ছে বোধ হয় ১৯০৩ সাল। সে এক রোমাঞ্চকর অনির্দিষ্টের পথে আমার একরকম নিরুদ্দেশ যাত্রা, কারণ এখন থেকে আমার চলাফেরা কাজকর্ম সবই হবে লোকচক্ষুর অগোচরে—এক-রকম বলতে গেলে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে। চোখে আমার তখন রঙীন নেশা, দেহে যৌবনের উচ্ছল উন্মাদ রক্তের নাচন, মাথায় আকুমারিকা হিমাচল ভারতে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব ভাবী মুক্ত গণতন্ত্রের মোহকারী স্বপ্ন।"

কলকাতায় ছিল মামার বাড়ি। বারীন্দ্র সেদিকে পা বাড়ালেন না। ডাকলেন ছ্যাকরা গাড়ি। স্টেশন থেকে সোজা ১০৮ নং সার্কুলার রোডে, যতীন্দ্রনাথের অন্দরমহলে।

যতীন্দ্রনাথ সঙ্গী পেয়ে মহা খুশী। আদর অভ্যর্থনায় মত্ত তিনি। একটু বিশ্রামের পরই বারীন্দ্রের জন্যে স্নানের ব্যবস্থা। স্নান সমাপন হলে আহার। মাছের মুড়োর ঘণ্ট এল। ছানার ডালনা এল। এল কচি পোনার ঝোল। আহারের পর মুখশুদ্ধি। উড়ে চাকর দিয়ে গেল সুগন্ধী মশলা মাখানো পান। এবং তারপরই এল অধিনায়কের নির্দেশ।

এখানে সমিতির বহু কাজ আছে। রাজনীতির রণনীতির বই পড়। শরীর চর্চা করো। এইভাবে তৈরী হতে হবে ভাবী সংগ্রামের জন্যে। তারপর লাগতে হবে কর্মী সংগ্রহের কাজে।

গোড়ার দিকে পাঠচক্রের কাজ চললো পুরোদমে। নিজের বই-গুলো সমিতিকে দেওয়ার সময় নিবেদিতা একটা সর্ত করে নিয়ে-
ছেন।

বইগুলি অবলম্বনে রাজনীতি শেখানোর এবং কর্মী পড়ার স্কুল খুলতে হবে। সেই স্কুলে বা পাঠচক্রে নিয়মিত আলোচনা হবে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি। এই স্কুল থেকে তৈরী হবে আসন্ন বিপ্লবের চারণদল। তারা ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে গঞ্জে, নগরে, গ্রামে। ছড়াবে বিপ্লবের বীজ। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবী সংগঠনের শাখা-প্রশাখা। তারপর শুরু হবে সশস্ত্র অভ্যুদয়ের অগ্নিকাণ্ড।

তাই হতে লাগল। পি. মিত্র সমিতির আপিসে আসতেন না। তিনি তার নিজের লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসেই নিতেন ইতিহাসের ক্লাস। বিশেষ করে তিনি পড়াতেন শিখ-অভ্যুত্থান ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। যেদিন যেদিন তাঁর ক্লাস, সেদিন সেদিন তাঁর বাড়ির লনে জমে উঠতো লাঠি খেলা। নিজেও লাঠি খেলায় ধুরন্ধর।

সখারাম গনেশ দেউস্কর ছিলেন দেওঘরে। বারীন্দ্রর কৈশোর-কালের প্রিয় শিক্ষক। স্বাধীনচেতা মানুষ। দেওঘরের অত্যাচারী মহকুমা শাসকের কথা হিতবাদীতে প্রকাশ করার অপরাধে শিক্ষকতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে হয় কলকাতায়। এখানে এসে চাকরি করতেন হিতবাদীর সম্পাদকীয় বিভাগে। বারীন্দ্র তাঁকে নিয়ে এলেন গুপ্ত সমিতিতে।

"ভারতে ভাবী সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে, বারীন্দ্র-কুমারের মুখে একথা শুনে তাঁর শৈশবের মন্ত্রদাতা শিক্ষাগুরু তো আনন্দে আত্মহারা। যতীন্দ্রনাথ ও পি. মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সমিতির অন্তরঙ্গ কর্মী হলেন। ক্রমে তাঁর উপর ভার পড়ল সমিতির অর্থনীতির ক্লাস নেবার।" সখারামবাবু পড়াতে লাগলেন ব্রিটিশ ভারতে আর্থিক শোষণের ইতিহাস। তাঁর সেই সব বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বক্তৃতাকেই এক সূত্রে বেঁধে 'দেশের কথা' বই। বৃটিশ সরকার যাকে অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করতে কালবিলম্ব করে নি।

সুরেন ঠাকুর আসতেন মাঝে মধ্যে। তিনি শোনাতেন বিভিন্ন জাতির জাতীয় জাগরণের ইতিহাস।

যতীন্দ্রনাথ নিতেন রণনীতির ক্লাস। তাঁর জীবনীকারের ভাষায় —"তা ছাড়া তিনি ছাত্রদের কাছে উচ্ছ্বাসভরা জ্বলন্ত ভাষায় ভাবী বিপ্লবের প্রয়োজনের কথা বলিতেন। তাঁহার ছাত্রদের কাছে শুনিয়াছি যে যখন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে জ্বলন্ত ভাষায় জন্মভূমির প্রতি ইংরাজদের অত্যাচারের কথা বলিতেন তখন মনে হইত যেন তাঁহার চক্ষু হইতে জ্বলন্ত গোলা নিক্ষেপ হইতেছে। এক এক সময় ভাবাবেশে দুঃখিনী জন্মভূমির কথা করুণ স্বরে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলিতে গিয়া তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিত।"

দেখতে দেখতে জমজমাট হতে লাগল সমিতির। এক দুই করে বাড়ল সভ্যসংখ্যা।

—ভিতরে আসতে পারি কি ?

সমিতির ক্যাম্পখাটে শুয়ে বই পড়ছিলেন বারীন্দ্র। এই সময়ে এই ডাক। তরুণ কণ্ঠস্বর। উঠে বসলেন বারীন্দ্র। তাকিয়ে দেখলেন—এক শান্ত শিষ্ট যুবক। পায়ে তালতলার চটি। মুখে স্মিত হাসি। গোবেচারা ছেলে। কি নাম ?

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আড়াবালিয়া গ্রামে আলাপ। যতীন্দ্রনাথ সেখানে গিছলেন সমিতির প্রচার অভিযানে। তখন অবিনাশচন্দ্রকে বলেছিলেন—কলকাতায় দেখা করতে। তাই আজ এই আকস্মিক আগমন। এই অবিনাশচন্দ্রই পরবর্তী কালে ভাবী যুগান্তর পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। বারীন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। অন্তরঙ্গ সহকর্মী।

তারপর একে একে দেবব্রত বসু। নলিন মিত্র। জ্যোতিষ সমাজপতি। বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন দত্ত। ইন্দ্রনাথ নন্দী। এরা কেউ একসঙ্গে দল বেঁধে আসেন নি। কালে কালে একে একে এসে যোগ দিয়েছেন বিপ্লবের মহাযজ্ঞে। যজ্ঞের হোমাগ্নির আভা

ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে যখন, যখন ধীরে ধীরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ দল সাড়া দিতে শুরু করেছে যজ্ঞে আত্মাহুতির আগ্রহান্বিত সংকল্পে ঠিক সময়ে শুরু হয়ে গেল সমিতির মধ্যে অন্ত-বিরোধ। একদিকে বারীন্দ্র, অন্যদিকে যতীন্দ্র। বারীন্দ্র মূল স্বভাবে আত্মকেন্দ্রিক, যতীন্দ্র মূলগতভাবে সৈনিকের মত নিয়মতান্ত্রিক। দুয়ের বিরোধে সমিতি যেন পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মত টলমল।

বিরোধের মূলে ছিল যতীন্দ্রর কড়া মিলিটারী মেজাজ। বারীন্দ্রের আপন কথায়—"দেবব্রত, আমি, মেদিনীপুরের জ্ঞান মামা—আমরা ছিলাম তাঁর হুকুমের সেপাইয়ের অনুপযুক্ত। বরঞ্চ তাঁর অধীনে নেতৃত্ব করারই যোগ্য। এ কথা যতীনদা বুঝতেন না, বহু স্বাধীনচেতা শিক্ষিত মানুষকে চালনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।"

কিন্তু বিরোধের প্রকাশ ঘটল অন্য পথে। যতীন্দ্রনাথের নামে রটানো হল তিনি চরিত্রহীন। কথাটা শুনে চমকে উঠলেন অনেকেই। বল কি? যতীন্দ্রনাথ? কি করে জানলে? প্রমাণ কি?

প্রমাণ? আজ্ঞে প্রমাণ তো যতীন্দ্রনাথের ঘরেই। একেবারে জলজ্যান্ত প্রমাণ। দেখেছেন তো ওঁর ঘরে একটি মেয়ে থাকে। যতীন্দ্রনাথ লোককে বলে বেড়ান, বোন। বোন না ছাই। মেয়েটি খারাপ। চরিত্রহীনা।

চরিত্রহীনা? কি করে বুঝলে।

আজ্ঞে, এ আর বোঝার ব্যাপার ব্যাপার কি? মেয়েটির গা ভরা যৌবনের দিকে তাকালেই বুঝতে এক তিল বিলম্ব হয় না। তিলোত্তমা হয়তো নয়। কিন্তু তন্বী তো বটেই। অমন মেয়ে যতীন্দ্রনাথের সংসারে থাকবে কেন? বিপ্লবের যিনি অধিনায়ক, তার ঘরে নায়িকার অধিবাস? এ আমাদের অসহ্য।

অভিযোগ ধূমায়িত হতে হতে একদিন সমিতির সভাপতি পি. মিত্র-র কানে গিয়ে হানা দিল। তিনি অতশত বুঝলেন না। খবরটা শুনেই অগ্নিশর্মা। তখুনি নির্দেশ, যতীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করতে হবে

সমিতি। যে যত বড় কর্মী হোক, নেতা সাজুক, নীতিহীনতার কোন ক্ষমা নেই।

"তরুণদের চক্রান্ত সফল হল। যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেণ্টের নির্দেশ জানানো হল। হয় মেয়েটিকে তাঁকে ত্যাগ করতে হবে, নয়ত সমিতি ত্যাগ করতে হবে। শুনে যতীন্দ্রনাথ তো আকাশ থেকে পড়লেন। এই আকস্মিক সংবাদ শুনে তিনি শুধু বললেন—'বারীন! তুমিই আমার এই দশা করলে!' সজল চোখে এইটুকু বলে তিনি জানালেন—নিজের বোনকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, অগত্যা সমিতিই ত্যাগ করবেন।"

যতীন্দ্রনাথকে জব্দ করার অভিপ্রায়েই ১০৮ নং থেকে বিপ্লবী সমিতিকে উপড়ে আনা হল মদন মিত্র লেনের একটা ছোট্ট বাড়িতে। বারীন্দ্র আর অবিনাশ এখানে সর্বেসর্বা। তাদের ফাই-ফরমাস খাটার জন্যে রাখা হল একটা চাকর।

কিন্তু সেখানেও সমিতির শিকড় বসল না। মদন মিত্র থেকে আবার আস্তানা উঠে এল ১৭০ নং আপার সার্কুলার রোডে। তার কারণটা অন্য রকম।

বিপ্লবী সংগঠনের গোড়ার দিকে যতীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন শরীর চর্চা আর রাজনীতির পঠন-পাঠনে। বোমা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাতে কলমে কাজ শুরু হবে আরও পরে। সংগঠন শক্ত হলে, বিস্তৃত হলে। বারীন্দ্রের দল তা চাননি।

একবার সমিতির কিছু যুবক তাদের অধিনায়কের পরামর্শ বা অনুমতি না নিয়েই নিবেদিতার কাছে হাজির।

—আপনার কাছে এলাম।

—কেন?

—আপনার রিভলভারটা আমরা কয়েকদিনের জন্যে ধার চাই।

—রিভলভার নিয়ে তোমরা কি করবে?

—আমরা ডাকাতি করতে বেরুব।

—ডাকাতি করে কি হবে ?

—সমিতির জন্যে, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে অর্থ সংগ্রহ হবে।

—তোমরা কি তোমাদের অধিনায়কের সম্মতি নিয়েছ ?

—না।

—তাহলে ফিরে যাও। রিভলভার আমি দেব না। এবং এ খবর তোমাদের দলপতিকে জানিয়ে দোব।

যতীন্দ্রনাথের কানে যখন খবর এসে পৌঁছল, তাঁর তখন মারমূর্তি চেহারা। হাতে ঝলসে উঠল চাবুক।

—সত্য স্বীকার কর নৈলে রক্ষা রাখবো না কারো।

যুবকরা সত্য স্বীকার করলে।

এত কড়াকড়ি বারীন্দ্রদের পছন্দ নয়। পছন্দ নয় এমন নিরামিষ বিপ্লবের আয়োজন।

মদন মিত্র লেনের বাড়িতে, যতীন্দ্রনাথের শাসনের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে, বারীন্দ্র আর অবিনাশ মনোযোগ দিলেন বোমা-বারুদের, মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর মাল-মশলা সংগ্রহের দিকে। সুরেন ঠাকুর জোগাড় করে দিলেন কয়েকটা রিভলভার।

একদিন ঘর খালি। বারীন্দ্ররা সবাই বাইরে। টেবিলের উপরে পড়ে ছিল একটা রিভলভার। অন্যমনস্কতার ফলে, বাসার চাকর অসীম কৌতূহলে পদার্থটা কি তাই দেখবার জন্যে নাড়াচাড়া ঘাঁটা-ঘাঁটি শুরু করে দিলে। ক্ষণপরেই একটা তুমুল শব্দ। খানিকটা ধূসর ধোঁয়া। তারপর অন্ধকার। চোখ থেকে অন্ধকার যখন ঘুচল, তখন তার চাকরিও খতম। চাকরের প্রস্থান। সেই সঙ্গে সমিতিরও আস্তানা বদল।

এবার ১৭০নং আপার সার্কুলার রোড। দোতালা বাড়ি। ছাদে চলে লাঠি খেলা। পি· মিত্রের বাড়ি কাছাকাছিই। ফলে সভাপতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় ভারী সুবিধে।

ওদিকে যতীন্দ্রনাথ অর্থাভাবে ছেড়ে দিয়েছেন আগের বাড়ি।

উঠে এসেছেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসে। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের গ্রামে, বর্ধমানের চান্না-য়। সেই সঙ্গে পাঠিয়েছেন একটা চিঠি। অরবিন্দকে। সমিতির ভাঙনের বৃত্তান্তসহ।

১৯০৪। পুজোর ছুটি। বরোদা থেকে অরবিন্দ ছুটে এলেন কলকাতায়। সোজা উঠলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসে। যতীন্দ্রনাথের উষ্ণ সান্নিধ্যে। ভেবেছিলেন যতীন্দ্রনাথকে দেখবেন ভাঙা, নির্জীব, নিস্তরঙ্গ। কিন্তু কই? দল ছেড়ে চলে গেছে। তবু আবার নতুন দল গড়তে তাঁর তো বিন্দুমাত্র হতাশা নেই। সঙ্গী পেয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে, এবং তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রকেও। বিদ্যাভূষণই সেকালে প্রথম ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী অনুবাদ করে সারা দেশে হৈহৈ ফেলে দিয়েছিলেন।

দেখে শুনে অরবিন্দ বুঝলেন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ সাজানো। ডেকে পাঠালেন বারীন্দ্র অবিনাশকে। তাদের জানালেন, যতীন্দ্র নিরপরাধ। তোমরা তার উপর অন্যায় করছো। সেই সঙ্গে এও স্থির হল যে মেয়েটির উপর সন্দেহ, একদিন সর্বসমক্ষে তাকে পরীক্ষা করে দেখা হোক।

পরীক্ষা হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হল মেয়েটিকে। চোখ, মুখ, নাক, কান, গড়ন-গঠন চলন-বলন, সব কিছু। শেষ পর্যন্ত বারীন্দ্রকে রায় দিতেই হল, হ্যাঁ, যতীনদার বোনই বটে।

সেইদিনই যতীন্দ্রনাথ বারীন্দ্রদের শোনালেন তাঁর হতভাগিনী বোনের জীবন কাহিনী। যতীন্দ্রনাথ তখন বরোদায়। সেই সময় বোনটি খারাপ সংসর্গে পড়ে বর্ধমান থেকে চলে আসে কলকাতায়। যে ভাবী সুখী জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেকে নষ্ট করতেও ভয় পায় নি, দিন ফুরোলে দেখা গেল তার সে স্বপ্ন মরীচিকা। যারা তাকে প্রলোভিত করেছিল, নিজেদের লালসা মিটিয়েই তারা পলায়িত। অবশেষে বোনটিকে গিয়ে উঠতে হল সমাজের মন্দ পাড়ায়। যেখানে বেচাকেনা চলে দেহের। নগদ মূল্যে ওজন হয় ভালবাসার।

বরোদা থেকে ফিরে যতীন্দ্রনাথ তাকে খুঁজে বার করলেন সেখান থেকে। তারপর থেকেই নিজের কাছে রেখেছেন আগলে। মনের ঘা জুড়োলে তাকে তৈরী করবেন আপন ইচ্ছার ছাঁদে, বিপ্লবী সংগঠনের কর্মী রূপে।

কাহিনী শুনতে শুনতে বারীন্দ্র হয়তো লজ্জিত হয়েছিলেন। অবিনাশ ব্যথিত। যে বোন হয়েছিল বিপ্লবী সংগঠনের পথের কাঁটা, শেষ পর্যন্ত তার জীবনের অভিশপ্ত কাহিনীর মধ্য দিয়েই জোড়া লাগল ভাঙা দলে। তেলে জলে আপাততঃ মিলন দেখে সবাই খুব খুশী। আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ হল শুরু। সমিতির আস্তানা উঠে এল যতীন্দ্রনাথের মেসে। অবিনাশ হয়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী। বারীন্দ্রকে অরবিন্দ নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে, দেওঘরে। তিনি জানতেন, বারীন্দ্রের চরিত্রের ভিতরে আছে একটা ভাঙনের স্বভাব। বারীন্দ্র শুধু আইডিয়া নিয়ে তুষ্ট থাকবার মানুষ নয়। তার মধ্যে রক্ত-মাংসের কামনা বাসনায় একটা পরিপূর্ণ মানুষ ভীষণ উগ্রভাবে জীবিত।

অবশ্য নিজের সম্বন্ধে এ খবর বারীন্দ্ররই কি অজানা ছিল? না, ছিল না। গুপ্তপ্রেমে বারীন্দ্রের অরুচি, এমন সিদ্ধান্তের প্রমাণ বারীন্দ্রর জীবনেতিহাসে কোথাও নেই। বরং এর উল্টোদিকটাই উজ্জ্বল। যার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন—

"একদিন ভোরবেলা ছাদে উঠে পূর্বাকাশে ঊষার অরুণ রাগের স্নিগ্ধ লাজ-রক্তিমার শোভাটুকু আনমনা হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি হঠাৎ আমার নাম ধরে কোমল নীচু গলায় কে ডাকলো। ফিরে দেখি পাশে গা-ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে। আমি আর থাকতে পারলুম না। তাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটি চুমো খেয়ে বললুম, 'কি এত সকালে ছাদে যে?'

হঠাৎ আমার বাহুর বাঁধনে তার দেহ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, মুখখানি ভয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, শঙ্কাতুর চোখ দুটি ছাদের দরজার

দিকে আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে রইল চেয়ে, সেই দিকে ফিরে দেখি ছাদের সিঁড়ির দরজায় তার মা মুখখানা কালো গম্ভীর করে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েকে নিয়ে তিনি নেমে গেলেন। বলির পশুটির মত আড়ষ্ট শঙ্কিত পায়ে সে সঙ্গে গেল। সেইদিন দুপুরবেলা সে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম একটা অন্ধকার ঘরে খালি তক্তাপোষের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদছে।....আমরা এর আগে সেই বারো তের বছরের ভালবাসাতেও কখনও এতদূর এগোয় নি। দুজনকে দুজনে প্রায় দেহসম্পর্কশূন্য হয়ে তবু নিবিড় একাত্মতায় ভালবেসেছিলাম। অবশ্য এটা ঠিকই যে এসব ক্ষেত্রে ভালবাসা মনের বা হৃদয়ের গণ্ডী-তেই আটকে থাকে না। অবসর ও সান্নিধ্য পেলেই ক্রমে ক্রমে প্রাণে, শেষে স্নায়ুতে তরঙ্গ তোলে, পরিণামে দেহেতেও গড়িয়ে আসে।"

এই যাঁর আত্মজীবনীর অংশ, গুপ্তপ্রেমের বেলায় তাঁকে নির্জলা পরমহংস বলে মেনে নেবার উপায় কোনখানে? তাহলে যতীন্দ্রনাথের সংসারের সুন্দরী যুবতিটিই যতীন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র অপরাধ নয়। তাহলে বারীন্দ্রর বিদ্বেষের উৎস কোথায়?

আসল ব্যাধি অন্যত্র। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব লোহার মত শক্ত। তাঁর নির্দেশ চাবুকের মত উদ্যত। তাঁর শাস্তি নিয়তির মত নির্দয়। যতীন্দ্রনাথের এই জবরদস্তি শাসনের বিরুদ্ধেই তরুণদলের বিক্ষোভ। আর এই তরুণ দলের নেতা বারীন্দ্র। তারা চেয়েছিল বেশ খানিকটা বেপরোয়া কিছু করে বেড়ানোর লাগাম-ছেঁড়া উৎসাহ। তারা চেয়ে-ছিল দেশপ্রেমের সঙ্গে মত্ততা মেশানো কিছু দৌড়-ঝাঁপ, দুরন্তপনার অবকাশ। যতীন্দ্র সব কিছুকে বাঁধতে চায় কেবল শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে।

অতএব আবার ভাঙন। অতএব আবার চিঠি অরবিন্দের কাছে, দেওঘরে। অরবিন্দ বুঝলেন, এ ফাটল বোজানো যাবে না। ওদিকে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে গিয়ে পি. মিত্রকে ধরলেন মিটমাটের জন্যে। চেষ্টা চলল। কিন্তু তাও কুঁড়িটুকু হয়েই ফুল হবার আগে

ঝরে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সমিতির মূল কেন্দ্র থেকে সরে আসতে হল যতীন্দ্রকে। অরবিন্দ বারীন্দ্রকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। তারপর যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী। নতুন নাম, নিরালম্ব স্বামী। অবশ্য সন্নাসী হয়েও তিনি বিপ্লবকে ভোলেন নি। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ছিলেন দুঃসাহসিক সৈনিক। কেউ কেউ তাঁকে যে 'অগ্নিযুগের ব্রহ্মা' আখ্যায় সম্মানিত করতে চেয়েছেন, সেটা তাঁর তেজস্বীতার প্রতি অনুরাগীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনের নৈবেদ্য।

কবিতা, কাটলেট ও বারীন ঘোষ

মানিকতলার মুরারিপুকুরে বিরাট আমবাগান। উপরে সবুজ পাতা। নীচে কালো ছায়া। আর সেই ছায়ার ভিতরে লাল আগুনের শিখা। বাগানের অন্যতম মালিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনি সেই বাগানের ভিতরে খুলেছেন একটা কারখানা। বোমা তৈরীর। বোমা তখনও তৈরী হয়নি। তোড়জোড়, তদ্বির-তদারক চলেছে। হেমচন্দ্র কানুনগো, একহাতে তলোয়ার আরেক হাতে গীতা তুলে দিয়ে অরবিন্দ যাঁকে মন্ত্রপাঠ করিয়েছিলেন গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার জন্য, তিনি গেছেন প্যারিসে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিখতে। সেটা বাইরের খোলস। আসল উদ্দেশ্য প্যারিস থেকে গুপ্ত সমিতির নিয়মকানুন আর সেই সঙ্গে বোমা তৈরীর ফরমুলা জেনে বা শিখে

আসা। ফিরতে তাঁর বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তাই বলে কি বন্ধ থাকবে বোমা বানানো? তা কখনো হয়? 'দাঁড়াও বানিয়ে দিচ্ছি বোমা' যেন এমনি অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করে, জামার আস্তিন গুটিয়ে, বুকের ছাতি ফুলিয়ে হাতের পাঞ্জায় শান দিয়ে এগিয়ে এলেন উল্লাসকর দত্ত। চোরাপথে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে চলল তাঁর বিরামহীন গোপন পরীক্ষা।

মানিকতলার আমবাগানেই বোমা তৈরীর একমাত্র কারখানা নয়। মানিকতলা হল কেন্দ্র। শাখা প্রশাখা বুঝি সারা শহরে ছড়ানো। মানিকতলায় তখন মানুষজনের ভিড় কম। বসতি স্বল্প। সুতরাং বারীন্দ্রদের মনে হয়েছিল যে এমন ফাঁকা জায়গায় বিপ্লবী তরুণদের দিনরাতের আনাগোনা কি আত্মগোপন সহজেই পুলিশের চোখ টানবে। তাই কারখানাকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গেল।

দেওঘরে খোলা হয়েছিল একটা শাখা। কিন্তু আকস্মিকভাবে এক ফেটে-যাওয়া বোমার আঘাতে তরুণ প্রাণ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটে গেল। তারপর থেকেই দেওঘরের কারখানায় তালা।

এবার শুরু হল কলকাতাতেই আস্তানা খোঁজার। চাই জন-বসতিপূর্ণ জায়গা। যাতে সহজে পুলিশের সন্দেহ না জাগে। জায়গা জুটল ভবানীপুরে।

"১৯০৮ সালের মার্চ মাসে সম্ভবত বোমা তৈরী শেখাবার স্কুল এখানে হল। ছাত্র ছিলেন চার-পাঁচ জন। এর মধ্যে একজন ছিলেন কানাইলাল দত্ত। নরেন গোসাইকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির দেওয়া হয়। আর একজন ছিলেন ইন্দুভূষণ রায়। বোমার মামলায় দণ্ডিত হবার পরে আন্দামানে তিনি আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় ছাত্র মেদনীপুরের নিরাপদ বা নির্মল রায়। কিন্তু কানাই-লালের সঙ্গে 'এক বাড়িতে' গ্রেপ্তার হন বোমার মামলার সম্পর্কে।

এখানে অবশ্য চাকর বাকর ছিল না। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই

পালা করে রান্নবান্নার কাজ সেরে নিতেন। থালা বাসনও নিজেরাই মাজতেন।"

অবশ্য ইতিমধ্যে হেমচন্দ্র ফিরে এসেছেন প্যারিস থেকে। তিনিই এখন বোমা তৈরীর শিক্ষক। এত কাণ্ডের পরেও ভবানীপুরের বোমার কারখানা যে তুলে দিতে হল, তার কারণ হেমচন্দ্রের নিজের কথাতেই শোনা যাক।

"দিনের বেলায় যে-কোন সময় ভবানীপুরে যেতাম ও ফিরে আসতাম, তখনই সঙ্গে থাকতেন সামান্য লোকের বেশে একজন গুলীখোরের মত লোক, আর কখনও কখনও ভৈরবী বেশধারিণী এক প্রৌঢ়া। এই প্রৌঢ়াটি যে কে তা জানতে পারিনি। ঐ ভদ্রলোকটি ছিলেন তখনকার স্বনামধন্য পুলিশ ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। শোভাবাজারে আমাদের বাড়ির সামনে একটা জঘন্য খোলার ঘর থেকে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমার চালচলন লক্ষ্য করতেন।"

ভবানীপুর গেল। এবার শ্যামবাজারের ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন। গরুর গাড়িতে করে ভবানীপুর থেকে বোমা বানানোর মালমশলা তুলে আনা হল শ্যামবাজারে। এই বাড়িতে থাকতো কানাইলাল দত্ত আর নিরাপদ রায়। এইখানে তৈরী হয়েছিল সেই বিখ্যাত বোমা, যা নিয়ে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে পা বাড়িয়েছিল কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করতে।

কিছুদিন আগেও গুপ্ত সমিতির সঙ্গে পাশাপাশি চলছিল বারীন ঘোষের দলের মুখপত্র 'যুগান্তর'। সেকালের অগ্নিবর্ষী বিপ্লবের বাহক। প্রতি অক্ষরে রাজদ্রোহ। অরবিন্দ তার প্রধান বেনামী লেখক। সেই অপরাধে প্রায় রোজই চলেছে পুলিশী খানাতল্লাসী। তছনছ হতে লাগল আপিসের কাগজপত্র। আজ এসে ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে চলে গেল। কাল নিয়ে গেল ছাপবার টাইপ। সম্পাদক-গোষ্ঠীর যখন যাকে হাতের সামনে পাওয়া গেল, তারই হাতে পড়ল

লোহার বেড়ী। এই সব উটকো উৎপাত দেখে-শুনে বারীন ঘোষ ভাবলেন, বাজে ঝামেলা পোয়াতে গিয়ে শেষে বিপ্লবটাই বন্ধ হয়ে যাবে নাকি? কাগজ তুলে দাও অন্য দলের হাতে। দলের মধ্যে যারা মাথাওয়ালা ছেলে, তারা কেউ মাথা গলাবে না কাগজে। তারা শুধু গুপ্ত সমিতির কাজই করবে। একহাতে বানাবে বোমা, আরেক হাতে সেটা ছুঁড়ে মারবে রাজকর্মচারীদের ঘাড়ে। তাই-ই স্থির হল। সময়টা ১৯০৭ সালের নভেম্বর।

বারীন ঘোষের দলের একজন পাণ্ডা হলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার একজন অন্যতম প্রধান আসামী। পরে হয়েছিলেন দ্বীপান্তরের বন্দী। তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় রয়েছে সেই বোমা-বানানো যুগের গুপ্তকথা।

"এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের ধুম পড়িয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা শুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিনটার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল।

একে একে এরূপ অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল, এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে।"—এই সঙ্কল্প হইতেই মানিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

মানিকতলায় বারীন্দ্রের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া আপিসের জনকয়েক বাছাই-করা ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে।

মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল, তখন সেখানে চার-পাঁচজনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই····ক্রমে ক্রমে বাংলা দেশের নানা জেলা হইতে প্রায় বিশ

জন ছেলে আসিয়া জুটিল।....যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর দত্ত তাহাদের মধ্যেই একজন।....

সে সময় কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজ-ওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিশের হাতে একতরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—'না, এ আর চলে না। ক-বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।'

তথাস্তু।

পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—যখন সাহেবদের মধ্যে ছোটলাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজরের মাথাটাই সবচেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাটসাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া তো সোজা কথা নয়। ডিনামাইট কার্ট্রিজ লাটসাহেবের গাড়ির তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর স্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্ট্রিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়া তো দূরের কথা—ট্রেনখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্ট্রিজ ফাটার গোটা দুই ফটফট আওয়াজ শূন্যে মিলিয়া গেল। লাটসাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্যন্ত হইল না। দিনকয়েক পরে শোনা গেল যে, লাটসাহেব রাঁচি না কোথা হইতে কলিকাতায় স্পেশ্যাল ট্রেনে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়া নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ঘাঁটি আগলান হইল। বোমাবিদ্যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি পরামর্শ দিলেন যে, রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে যেন বোমাটা পুরিয়া রাখা হয়। তাহার পরে সময়মত তাহাতে শ্লো-ফিউজ লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কার্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাটসাহেবের এমনি অদৃষ্টের জোর যে, বোমা পুঁতিবার দিন আমাদের ওস্তাজী পড়িলেন জ্বরে, আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন, তাঁহারা একেবারে ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। কাজেই বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল, গাড়ি উড়িল না।"

আছাড় না খেয়ে কে কবে হাঁটতে শিখেছে। সুতরাং বারীন ঘোষ দমবার পাত্র নন। আবার নতুন করে শুরু হল বোমা-বানানো।

১৯০৮-এর জানুয়ারি। সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল চরমপন্থী বনাম নরমপন্থীদের বাক্‌-বিতণ্ডা, বাদ-প্রতিবাদে। অরবিন্দ সুরাট থেকে চলে গেলেন বরোদায়। সেখানে গিয়ে সাধু লেলে মহারাজের সঙ্গে নির্জনে প্রায় অজ্ঞাতবাস রইলেন কিছুদিন। বারীন সেই সময়ে অরবিন্দের সঙ্গী। গুহার মধ্যে থাকেন। সাধুর স্ত্রী রাঁধেন। তাই-ই খান-দান। সাধু-বাক্য শোনেন বটে, কিন্তু মগজে ঢোকে না। সাধনায় তাঁর মন নেই। সাধ অন্য। সন্ধান অন্যত্র।

"আমায়ও লেলে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে, কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজগজ করিতেছে; তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দেবে কেন? কাজেই কোন গতিকে ফাঁক পাইলেই আমি সরিয়া পড়ি এবং একটি তালা-ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখি ও শিখি। বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে, কোথা তাহা শিখিব, তখন আমার কেবল সেই চেষ্টা। ভগবানকে ঠিক তখনই সদ্য-সদ্য না পাইলেও আমার চলে, তবে তিনি যদি বোমার কারখানার মিস্ত্রী বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভরা লোহার সিন্দুক হইয়া আসিতেন, তাহাতে আমার বড় আপত্তি ছিল না।"

বোমাই তখন বারীন ঘোষের শয়ন-স্বপনের ধ্যান-জ্ঞান, দিবা-রাত্রির জপ-তপ। কিন্তু এই 'বোমাড়ে' হয়ে যাওয়াটা বারীন ঘোষের জীবনে একটা হঠাৎ ঘটনা। এটা যে ঘটবে তা তার নিজেরও জানা ছিল না।

১৯০২-এ ছিলেন বরোদায়, দাদা অরবিন্দের কাছে। সেই সময়েই হঠাৎ একদিন অরবিন্দ তাঁকে কলকাতায় পাঠালেন গুপ্ত সমিতি গড়ার দায়িত্ব দিয়ে। সেই থেকে বিপ্লবের হাতে-খড়ি। সেই থেকে অঙ্গ জুড়ে রণসজ্জা।

কিন্তু অরবিন্দ যদি বারীন্দ্রকে না পাঠাতেন কলকাতায়, তা হলে কি ঘটতো। বোমার বদলে কি বানাতেন বারীন ঘোষ ?

হয় কাটলেট, নয় কবিতা।

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটা নির্জলা সত্যি। কাটলেট আর কবিতা বানাতে বানাতেই বারীন ঘোষ হঠাৎ একদিন বসে গেলেন বোমা বানাতে। অবশ্য কাটলেট এবং বোমা এ দুটোর কোনটাই তিনি নিজের হাতে বানাননি। নিজের হাতের ছোঁয়া ছিল কেবল কবিতায়। বাকী দুটো তিনি অন্যকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন।

এবার তাঁর কবি হওয়ার কাহিনী তাঁর নিজের মুখে শোনা যাক।

"আমি তো তখন তের বছর বয়স থেকেই রাবীন্দ্রিক ঢঙে কবিতাই লিখছিলুম। প্রথমে কবি মানকুমারীর কবিতা আমার কবিতা লেখার ছিল আদর্শ। তারপর এলেন তাঁর অপূর্ব ঝঙ্কার ছন্দ ও মধু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব কবিতা তখনও আমি পড়িনি। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তার একটু পূর্বস্বাদ পেয়েছি মাত্র।........ এত অল্প বয়সে কবি হবার আর এক কারণ এই বয়সে আমার প্রথম প্রেমে পড়া। আমার সে প্রেমের পাত্রীকে যখন প্রথম দেখি তখন সে দশ বছরেরটি। বড় বড় ভাষা চোখ। গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ কিশোর তনু। এই ভালবাসা গভীর হয়ে আমার হৃদয় ও প্রাণসত্তা জুড়ে তের বছর অবধি ছিল; ব্রাহ্ম সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। উপার্জনোক্ষম না হয়ে অন্ততঃ ছেলেরা সমাজে বিয়ের কথা ভাবেই না। আর অত ছোট বয়সের ভালবাসায় অতদূরের হিসেব কি থাকে ? তার ওপর সে ছিল আমার নিকট আত্মীয়া। আমিও ছিলুম কবি। দেহ সম্বন্ধটার ওপর ছিল নবোঢ়ার ভয়, সংকোচ ও ঘৃণা। মাটির বুকের পদ্মটির জন্যে আকাশচারী চাঁদের অতৃপ্ত আকুল পিয়াসা, পনেরটি দিন ধরে কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে উঠতে সারা হৃদয় মণ্ডলের কিরণ ঢেলে দয়িতকে ছোঁওয়া, ঘিরে থাকা,

ব্যাকুল করা, তাকে আলোর বন্যায় ডুবিয়ে রাখা আর তারপর তাকে না পাওয়ার শোকে আবার নীরবে কলায় কলায় ক্ষয়ে যাওয়া। এই রকম ছিল আমার কামগন্ধহীন সেই কৈশোর যৌবনের কবিত্বময় স্বপ্নালু প্রেম।........

আমার প্রথম প্রেম ছিল অশ্রুতে ভরা। বিষাদ-কুয়াসায় আচ্ছন্ন কোজাগরী রাত। বার বছরেরটি হয়ে সে ভালবাসতো আমার এক মাসতুতো ভাইকে। আমার দিকে তার রূপমদির চোখে কতই না অবহেলায় আঁচল উড়িয়ে চলে যেত। আমার বুকটা নিংড়ে সে রূপোদার দলে গিয়ে মিশে কাপাটি খেলতো। আমার দুচোখ ফাটিয়ে জল বের করে অম্লানবদনে তারই হাত ধরে সে বেড়াতে বেরুতো। আমার জগৎ সংসার উদাস করে দিয়ে তারই পাশটি ঘেঁষেই বনভোজনে বসতো। আমি আর সহ্য করতে না পেরে মাঠের মাঝে পাথরের উপর গিয়ে চুরমার করা আবেগে বিরহের কবিতা লিখতুম।”

দেওঘরেই কবি বারীন্দ্রের জন্ম। সেখানেই কবিতা পড়া, আর লেখা। মানকুমারীর কবিতার প্রভাব তাঁর কবিতায় পড়েছিল প্রথম জীবনে, এ তো নিজেই বলেছেন। এমন কি শেষ জীবনেও যখন উদয়াচলের দিকে পা বাড়ানো, তখনও আবৃত্তি করছেন মানকুমারীর কবিতা।

রুক্ষভাষী রাঙা মুখ
অবিচারে পূর্ণ বুক
সেবিতে তাদের পদ জীবন ধরা
কোন পোড়ামুখে কব
আমরা কারা।

মানকুমারীর ছাড়া আরেকজন মহিলা কবির প্রিয় পাঠক ছিলেন তিনি। কামিনী রায়। কামিনী রায়ের ‘সোনার স্বপ্ন’ ছিল তাঁর প্রিয় কবিতা।

শুনে যা আমার মধুর স্বপন
শুনে যা আমার আশার কথা !
শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য বেদস্তুতি উঠিতেছে ধীরে
পুণ্য গোদাবরী
নর্মদা কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা ;
হেরিনু যতেক ভারত সন্তান
লাজে নত শির জ্ঞানে গরীয়ান
আসিয়াছে যেন তেজ মূর্তিমান
অতীত সুদিনে আসিও যথা।

কবিতা ছাড়াও কবি বারীন্দ্রের জীবনে গানের প্রভাব পড়েছিল গভীর হয়ে।

ভোমরা রে,
কি মধু পিইয়ে হলি ভোর ?
তরল পরান তোর জমাট বাঁধল রে।
গুণ গুণ গুণ করে কত কেঁদেছিলি
কি মধু পড়িল মুখে চুপ হয়ে গেলি রে !

হাতে বীণা। গলায় এই মধু ঝরানো গান। আকাশে জ্যোৎস্না-ঝরানো রাত। দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ির পশ্চিম দিকের গোলাপ বাগানে বসেছে গানের আসর। গাইছেন ইন্দুবাবু। 'রসলীলা'র রচয়িতা।

"এই ধরনের গানগুলি এখনও আমার স্মৃতির ফলকে একেবারে মুছে যায়নি।

তারপর ইন্দুবাবুর সে রসের উজান শুকিয়ে গেল। তিনি সংসারে ঢুকলেন। 'রসলীলা'ও আজ বাংলা সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। 'রসলীলা' আমার জীবনকে রসাল করে দিয়ে

গেছে   ·এই রকম ভাব ও রসপূর্ণ কথা অ-কবীকে কবি করে ছাড়ে

আজ কবি বারীন্দ্রের কোন পরিচয়ই কোথাও হাতড়িয়ে হাতে ছোঁয়ার, চোখে দেখা, কি কানে শোনার উপায় নেই। কবি বারীন্দ্র-কুমার যেন লোকশ্রুতি। তাঁর জীবনীকারের সেই খেদ।

"বরোদার ফাঁকে ফাঁকে দেওঘরে আবার দেওঘরান্তে বরোদায় এই চলতে লাগল বারীন্দ্রকুমারের জীবন। আর এই নিরবচ্ছিন্ন আরামের মধ্যে চলছিল কাব্যচর্চা, কবিতা ও উপন্যাস লেখা। দৈনন্দিন জীবনের কিছুটা অংশ অধিকার করত উদ্যানচর্চা। 'মিলনের পথে' উপন্যাস লেখা তখন চলছিল, তারপরে ছাপবার আগে এর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। এ ছাড়া কবিতা লেখাও চলছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেলী ঢং-এ একখানা বড় রকমের কাব্য লেখাও সমাপ্ত হয়েছিল। এগুলির ভাগ্য কি হয়েছে তা আজ জানবার উপায় নেই।

এবার কাটলেট প্রসঙ্গ।

লেখাপড়া শেষ। বেকার জীবন। ট্যাক গড়ের মাঠ। এই রকম একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন যখন, সেই সময়ে এক বন্ধু বুদ্ধি বাতলালে পাটনায় গিয়ে দোকান কর। বারীন্দ্রর ইচ্ছে ছিল কৃষির। টাকার অভাবে সেটা হয়ে উঠল না। তাহলে দোকানই ভাল।

হাতে ন'শো টাকা মূলধন। পাওয়া গেছে রাঙা-মা-এর বাড়ি বেচা টাকা থেকে পুরনো ঋণ শোধ করার পর উদ্বৃত্ত হিসেবে। রাঙা-মা বারীন ঘোষের আরেক মা। কে. ডি. ঘোষের আরেক স্ত্রী। সমাজের চোখে যাই হোক কিন্তু বারীন্দ্রর কাছে রাঙা-মাই মায়ের চেয়ে বেশি।

"তাই ঠিক হলো, মা যাবেন সঙ্গে, কিন্তু আগে আমি গিয়ে দোকান সাজিয়ে বসবো।···সাবান, চিরুনী কাগজ-পেন্সিল, সেণ্ট-পাউডার, বল, মারবেল, রঙীন সুতো, পুঁতির মালা—মানুষের মন

ভোলাবার কত রকম সাজ-সরঞ্জামই না আমার সঙ্গে চললো বাঙলার নীল আকাশ ও শ্যাম ধরণী ছেড়ে এক্কার দেশে, ধুলোর জগতে, লাল মাটির রাজ্যে। পাটনা কলেজের গেটের সামনে বাঁদিকে রাতারাতি সাইনবোর্ড উঠল।—"B Ghose's Stall"—মনোহারী দোকানের রকমারি রঙীন মালের চেয়ে দোকানই বোধ হয় বেশি মনোহারী হয়ে উঠলো, কারণ, আলাদীনের প্রদীপের রাতারাতি সৃষ্ট এই ক্ষুদে দোকানীকে দেখে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সেখানে লেগে গেল ভিড়।····ভিড় দেখে আমার মাথায় খেললো চায়ের দোকান দেবার মতলব।····ভদ্রলোকের ছেলের চায়ের দোকান সেই-ই প্রথম। আজ যে চায়ের দোকান নানা দেশী-বিদেশী চটকদার কাফে, কেবিন, রেস্তোরাঁ, গ্রিল আদি নামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গজাচ্ছে, আর মরছে, তখনকার দিনে সেদিকে করুর মাথা তখনও খেলেনি। বোম্বাইয়ে পার্সীদের 'টি স্টল' ছাড়া আর কোথাও কারুর এজাতীয় জিনিস আমার চোখে পড়েনি।

বাঁকীপুরে বাঙালীর আরও বড় বড় মনোহারী দোকান ছিল, কারু মূলধন দশ হাজার, কারু বা পনেরো হাজার ; তার মাঝে ছয়-সাত শ' টাকার ঐ এতটুকু দোকান কিছুদিন যে আসর জমকে ছিল এই-ই আশ্চর্য।····রাঙা-মাকেও কাছে এনেছি, একটা চাকর রেখেছি ; আর চায়ের দোকান ফুলে-ফেঁপে চপ-কাটলেটের দোকানে পরিণত হয়েছে। ভিতর বাড়িতে মা রাঁধতেন মাংসের কারি, চপ ও কাটলেট। আর আমি তা চায়ের মজলিসে বেচতুম মাখন, রুটি ও ডিমের সঙ্গে সঙ্গে।"

তারপর দেখতে দেখতে দোকানে খদ্দের এবং ধার দুই-ই বাড়তে লাগল পুরাদমে। টাকার অভাবে মাল কেনা যায় না। লাভের ঘরে ক্রমশ জমতে রইল শূন্য। এবং একদিন হঠাৎ পাটনাবাসী জনসাধারণ দেখতে পেল, তাদের কলেজ গেটের সামনে হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা দোকানের সাইনবোর্ডটা মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

"মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্থির করলুম যে, বরোদায় সেজদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে কিছু মূলধনের চেষ্টা করবো।... পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমিও বাঁকীপুর ত্যাগ করলুম আর বি ঘোষের স্টলের চটকদার সাইনবোর্ডখানি হঠাৎ গেল উবে।....চায়ের চাতাল নেশাড়েরা সেদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় দোকানের বন্ধ দরজায় প্রথমে বিস্ময়-বিমূঢ় ও পরে বিরস ম্লানমুখে ভিড় জমিয়েছিল নিশ্চয়ই। আমি তখন উড়ন্ত পাহাড় পর্বত দু' পাশে ফেলে নদী নালা বন কান্তারের মেলার মধ্যে দিয়ে হু-হু করে চলেছি আমার জীবনের নতুন রঙ্গভূমির দিকে।

আমি যে মানিকতলা বাগানের বোমাড়ে বারীন ঘোষ হতে চলেছি, সেই উদ্ভট বিপ্লবের প্রথম পুরোহিত হব বলেই যে আমার এত সাধের চায়ের দোকান আর মনোহারী বিপণী দেখতে দেখতে আকাশ-কুসুমের মত ফুটলো আর মিলিয়ে গেল, তা তখন আমিই বা জানব কেমন করে?... একটা ময়লা ক্যানভাসের ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রেনে যখন চেপেছি, তখন মনে জাগছে টাকা নিয়ে ফিরে আসার আকাশ-কুসুম, ফাঁকা মাঠের মাঝে সবুজ গাছপালায় ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের স্বপ্ন, সেখানে গো-ঘণ্টা-রণিত গাঢ় সন্ধ্যার সোনালী কুহকে কবিতা লেখা ও বহুদিনের বিস্মৃত প্রণয়িনীর সঙ্গে হঠাৎ মিলন। তখন কে জানতো, সে কৃষিক্ষেত্রের আলু-পটলের বদলে গজাবে বোমা, সে আকাশ-কুসুম ফাটবে স্বপ্নাচ্ছন্ন দেশকে জাগিয়ে আগুনের হলকায় দিক-কাঁপানো নিনাদে, সে প্রণয়িনী আসবে ফাঁসির কাঠ হয়ে মৃত্যুর সুরাপাত্র হাতে, নিয়ে যাবে আমায় হাজার মাইল কালাপানির পারে কোনো এক হরিত দ্বীপে দ্বাদশ বৎসরের একান্ত বাসের জন্য।"

এসব অনেক পরের কথা। এখনো বারীন ঘোষ 'বোমাড়ে' হননি। বরোদায় এসেছেন সেজদার কাছে টাকার সন্ধানে। টাকা মিলল না। তার বদলে মিলল এক আয়েসী কাব্য-জীবন। বরোদার বাড়ির ভিতর মহলে একখানা ঘর। সেখানে কবিতার

খাতা, এস্রাজ, নভেলের স্তূপ, বাগান গড়ার সাজ-সরঞ্জাম। এরই মাঝে মাঝে শিকার-পর্ব।

"বরোদায় স্নিগ্ধ শান্ত রসাক্ত দিনগুলি আমার জীবনে এনেছিল নিরবচ্ছিন্ন আরাম, প্রচুর অবসর, নিরিবিলি নিরুদ্বিগ্ন একটানা সুখ, মৃগয়ার উত্তেজনা, কবিতা ও উপন্যাস লেখার অনাবিল আনন্দ আর আমার ছোট্ট বাগানটির মাঝে কৃষিকার্যে সখটুকু মেটাবার তৃপ্তি। ....তখন কি যে মাথামুণ্ডু কবিতা লিখতুম, তা আর এখন একটাও বেঁচে-বর্তে নেই, একটা কাব্য লিখেছিলুম বেশ বড় রকমের, কতকটা মাইকেলী ঢঙে, তবে অমিত্রাক্ষরে নয়।"

এসব ছাড়া সুখের ছিল আরও একটা উদ্দাম উপকরণ।

"বিকেলের দিকে বরোদার পার্কে বেড়াতে যেতুম, রাজ-পুরাঙ্গনারা আঁটসাঁট বন্ধ ঢাকা ব্রুহামে বা মোটরকারে বস্তাবন্দী হয়ে ব্যাণ্ড শুনতে আসতেন। দু-চারজন তন্বী গৌরাঙ্গী পার্শী মেয়ে হাত ধরাধরি করে ছেলেদের মধ্যে রূপ লাবণ্যের টানা ও পোড়েন দিয়ে দিয়ে পায়চারী করতেন, দর্শকদের মুগ্ধ প্রাণের তাঁতে মোহের সূক্ষ্ম চিনাংসুকখানি বুনতে বুনতে। রূপ-ক্ষুধাতুর চোখে এইসব দুর্লভ মেনকা তিলোত্তমাদের চেয়ে চেয়ে দেখাই ছিল তখনকার দিনে একটা মস্ত দরকারী কাজ, যেদিন পার্কে যাওয়া বাদ পড়তো, সেদিনটা বুকের মাঝে একটা খাঁ-খাঁ করা শূন্যতা রেখে যেত।"

বেশ দিন কাটছিল কবিতার ত্রিপদী ছন্দে। ছন্দোভঙ্গ হল হঠাৎ একদিন। সেজদা অরবিন্দ ডেকে বললেন, কলকাতায় যাও। গুপ্ত সমিতি গড়ো। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব তখন জাপানে। অরবিন্দের কাঁধে তখন নেতৃত্বের ভার। তাঁরই নির্দেশে বরোদা সেনাবিভাগের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় চলে এসেছেন কলকাতায়। যতীন একা হয়তো পারবে না। তাই বারীন ঘোষের উপর এই হুকুমনামা। বারীন্দ্র কলকাতায় চলে এলেন। প্রথমবারের গুপ্ত সমিতির আন্দোলন

ভেঙে গেল যতীন্দ্র-বারীন্দ্র বিরোধে। দ্বিতীয় দফায় আবার যখন গুপ্ত সমিতি শুরু হল, তখন বারীন ঘোষ সত্যি-সত্যিই 'বোমাড়ে' হয়েই বাংলা দেশের রাজনৈতিক জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন। বাংলা দেশ তখন বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের ঘনঘটা। আকাশ আগুনের রঙে রাঙা। বাতাসে প্রলয়ের সাড়া। এদিক ওদিকে গোপন সন্ত্রাসবাদের গর্জন। 'বোমাড়ে' বারীন ঘোষ সেই সন্ত্রাসবাদী মুক্তিযজ্ঞের প্রথম পুরোহিত।

পরিণত বয়সে একদিন প্রশ্ন করলেন নিজেকেই—"যে ভাবুক খেয়ালী মানুষ বাবরি চুল রাখে, অতি সযত্নে ঢেউ-খেলানো টেরি কাটে, নাগরা জুতো পায়ে দেয়, দেওঘরের পাহাড়ে বসে রবিয়ালী ভাষায় ও ভাবে প্রেমের কবিতা লেখে, বাঁকীপুরে গিয়ে মনোহারী দোকান ও চায়ের স্টল খোলে আবার এক কথায় সেই দোকান তুলে দিয়ে বার শ' মাইল দূরে গুর্জর দেশে পাড়ি জমায়, সে মানুষ হঠাৎ কেন এমন একটা বীভৎস গুণ্ডামির কাজে হাত দিল?"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজেরই কণ্ঠ অথবা কলম থেকে বেরিয়ে এল উত্তর।

"কবিতা লেখা আর প্রকৃতির হরিত কোলে কৃষি-উদ্যান রচনা করার ঘোরাল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার এইভাবে একটা খুনোখুনির মাঝে নামাটা আপাত চোখে বিসদৃশ ও ছন্দপতন মনে হলেও হয়তো পরাধীনতার ব্যথায় আতুর দেশে ঐরকমই হয়। কত নিপীড়িত পরপদদলিত দেশে কত কবি ভাবুক শিল্পী প্রেমিক নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে দেশের দরদে, এই মুক্তির পাগল-করা স্বপ্নে।"

কাটলেট পারেনি, কবিতা পারেনি, শেষ পর্যন্ত আগুনে বোমাই বারীন ঘোষের নামকে রাঙা করে তুলল চারিদিকে।

মেঘনাদবধ কাব্য ও ফুলার সাহেব

ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি।

রুদ্ধ দ্বারের ভিতরে ভীষণ এক গোপন বৈঠক।

একটা হত্যার চক্রান্ত।

একটি হত্যাকারীকে পৃথিবী থেকে আপসারণের গভীর মন্ত্রণা।

এক মন্ত্রণার তিন মন্ত্রী।

রাজা সুবোধ মল্লিক। অরবিন্দ আর সিভিলিয়ান চারু দত্ত।

যিনি নিহত হবেন তাঁর নাম স্যার বামফীল্ড ফুলার। পূর্ববঙ্গের জঙ্গী লাট। ব্রিটিশ শোষণের জাঁদরেল প্রতিনিধি। ব্রিটিশ শাসনের নির্দয় প্রতিভূ।

সুরেন ঠাকুর, অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ এগিয়ে এলেন এক হাজার টাকার তোড়া নিয়ে।

এই নাও। কেল্লা ফতে হলে আরও টাকা দেব।

কার উপর ভার দেওয়া যায় এই গুরু দায়িত্বের? কে পারবে ফুলার নামক সর্বশক্তিমান খোদার উপর খোদকারী ফলাতে? অরবিন্দ বললেন, বারীন্দ্র একা নয়। তার সঙ্গে থাকবে মণি লাহিড়ী।

লাট সাহেব এখন শিলং-এ। ঐ শিলং-এই অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু কৃষি বিভাগের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেকটার। বারীন্দ্ররা সেখানে গিয়ে উঠবে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার। সঙ্গে থাকবে শ্বশুরকে লেখা অরবিন্দের চিঠি। শিলং-এ কাজ শেষ করে টাঙ্গায় চেপে হত্যাকারীরা পালাবে গৌহাটিতে। ব্যাস।

পরিকল্পনা শেষ। পরিচয় পত্র প্রস্তুত।

ভূপাল বসু বারীন্দ্রর হাত থেকে তুলে নিলেন সেই পরিচয় পত্র। তাতে লেখা ইংরেজীতে—

বারীন ও মণি যাচ্ছে আপনার কাছে। তারা ওখান থেকে শরীর সারিয়ে ফিরবে। বারীন বড় চঞ্চল প্রকৃতির। সর্বদা মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ে-পর্বতে বেড়াতে ভালবাসে। আমি তার এই ভবঘুরে প্রকৃতির বিরোধিতা না করাই শ্রেয় মনে করি।

শিলং-এর সার্কুলার রোড। ফুলার সাহেব রোজ এখানে বেড়াতে আসেন ঘোড়ায় চেপে। বারীন্দ্ররা রোজ ঐ সার্কুলার রোডের চারপাশে ঘুরে বেড়ান। ঠিক কোনখান থেকে গুলিটা করা হবে তারই জায়গা খুঁজতে। গুলি করার পর কোনপথ দিয়ে পালানো হবে টাঙ্গা হাঁকিয়ে। প্রতিদিন চলেছে এরই প্রস্তুতিপর্ব।

এই সময় হঠাৎ ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আকস্মিক বিস্ফোরণ। মণি লাহিড়ীর ডান হাতের পাতা একদম গর্ত করে দিয়ে গুলি ছুটল। তারপর ডাক্তার, সেবা-শুশ্রূষা এবং লোক জানাজানির আগেই বারীন্দ্রদের শিলং থেকে

হাওয়া। ফুলার সাহেব যথারীতি প্রত্যহ সকালে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে লাগলেন।

ওদিকে বারীন্দ্রদের কোন খবর না পেয়ে, খবরের কাগজে ফুলার হত্যার খবর না পেয়ে অরবিন্দ অস্থির।

হেমচন্দ্র কানুনগো কদিনের জন্যে এসেছেন কলকাতায়। ছেলে অসুস্থ। তারই চিকিৎসা উপলক্ষে। অবসর জুটলেই ছুটে আসেন নেতাদের কাছে। অরবিন্দবাবুরা তখন ভাবছেন, বারীন্দ্র বোধ পারল না। অন্য কাদের পাঠানো যায়?

প্রথম নাম ক্ষুদিরামের। তারপর মেদনীপুরের জ্ঞান বসু। কিন্তু কাউকেই খুব নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না। এই সময়ে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। অরবিন্দর হাতে স্বর্গ।

স্ত্রী-পুত্রকে মেদনীপুরে পৌঁছে দিয়ে হেমচন্দ্র দিলেন শিলং পাড়ি। ১৯০৬। মে মাস। ভূপেন দত্ত তুলে দিয়ে এলেন শিয়ালদা-র গাড়িতে। সঙ্গে দুটো রিভলবার। এক প্রস্থ সাহেবী পোশাক। অন্যান্য টুকিটাকী নিত্য ব্যবহারের জিনিস।

শিলং যাবার সময় মাঝপথে বারীন্দ্রদের সঙ্গে দেখা।

কি ব্যাপার? ফুলার মরেছে?

হেমচন্দ্রের গলায় উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

বারীন্দ্রদের বিষণ্ণ উত্তর—না।

এবার তিনে মিলে কাজ। এবার হত্যার পটভূমি শিলং নয় গৌহাটি। কিন্তু বিধি সাধল বাদ। লাটসাহেবের যে ভ্রমণসূচী অনুযায়ী গৌহাটিতে জাল ফেলা, জানা গেল সেটা নকল। প্রকৃত ভ্রমণসূচী নয়। আসলে লাটসাহেব এখন চলেছেন বরিশাল।

তিন বিপ্লবী বরিশালে এসে হাজির।

এক সঙ্গেই দুটো স্টীমার এসে থামল বরিশালের ঘাটে। আকাশে ভোরের সদ্য ফোটা রাঙা আলো। বারীন্দ্রদের মনে রাঙা স্বপ্ন। দূর থেকে তাকিয়ে দেখছে, লাটসাহেবের স্পেশাল স্টীমার

'ব্রহ্মকুণ্ড' ভিড়ল জেটিতে। লাটসাহেব নামছেন। শহরের সম্ভ্রান্ত-জনেরা তাকে সাদর অভ্যর্থনায় ঘিরে ফেলল। লাটসাহেব চললেন শহরের দিকে। বারীন্দ্রদের স্টীমারের কি নাম ছিল জানা যায় নি। 'অগ্নিকুণ্ড' নিশ্চয় নয়। কিন্তু তারা নিজেরা আক্রোশে, আস্ফালনে, উদ্বেগে, উত্তেজনায় এক একটি অগ্নিকুণ্ডের মতই প্রজ্বলন্ত।

বরিশালের অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে বারীন্দ্রর দেওঘরে পরিচয়। দাদু রাজনারায়ণ বসুর বৈঠকখানায়। অশ্বিনীকুমার বারীন্দ্রদের আশ্রয় দিলেন। ডেকে পাঠালেন বরিশালের ছাত্র প্রতিনিধি। ব্যবস্থা করে দিলেন গোপন বৈঠকের।

বৈঠক জমল ঠিকই। কিন্তু ইতিমধ্যে লাটসাহেব তাদের বেমালুম ঠকিয়ে দিয়ে বরিশাল থেকে সোজা আবার গৌহাটিতে গমন করে গেছেন।

আবার গৌহাটি। কিন্তু বরাত মন্দ। এখানে এসে জানা গেল লাটসাহেব যাবেন রংপুর।

ছোট রংপুরে। রংপুরে পৌঁছে জানা গেল লাটসাহেবের এখানে পদার্পণ করতে কদিন বাকী এখনো। তাহলে ? তিন বিপ্লবীই ইতি-মধ্যে একমত যে গুলি করে লাটসাহেবকে মারা যাবে না। তাহলে ?

বোমা চাই। রেললাইনে থাকবে পোঁতা।

কিন্তু বোমা বানাবার মশলা কই। টাকাই বা কোথায় ? ঘুরতে ঘুরতে মূলধন তো কাবার। খাবার পয়সার টান।

হেমচন্দ্র বললেন—তাহলে যাই কলকাতায়, টাকা নিয়ে আসি।

অরবিন্দ নিজের ট্রাঙ্কের দশদিক হাতড়ে কোনমতে খুঁজে পেলেন মাত্র পঁচিশ টাকা। হেমচন্দ্র বললেন, ঐ পঁচিশ এখন পাঁচলাখ।

মাত্র পঁচিশ টাকা পেয়ে বারীন্দ্রর মাথায় হাত। এ তো তাতল সৈকতে বারি বিন্দু। এ নস্যি নস্যাৎ হতে কতক্ষণ।

বারীন্দ্র চিঠি পাঠালেন অরবিন্দকে, আরো টাকা চাই।

অরবিন্দ নরেন গোসাঁইকে বললেন—

ওহে তুমি খুব হুমকী দাও মাঝে মাঝে, ডাকাতিতে তুমি নাকি দক্ষ। রংপুরে যাও। ডাকাতি করে টাকা নিয়ে এস।

নরেন গোসাঁই-এর ডাকাতির সব পাকা ব্যবস্থা কেঁচে গেল। কাঁচা টাকা আর জোগাড় হল না।

এবার বারীন্দ্র নিজে উঠে পড়ে লাগলেন ডাকাতির ব্যাপারে। ওদিকে ধুবড়ীতে গেল একদল ছেলে। লাটসাহেবের গাড়ি দেখলেই তারা তার করে খবর দেবে। রংপুরে ট্রেন এসে পৌঁছবার আগেই মাইলখানেক দূরের লাইনে বোমা রাখা হবে লুকানো। স্টেশনের উল্টো দিকে একমাইল দূরে থাকবে হেমচন্দ্র আর প্রফুল্ল চাকী। তাদের হাতে থাকবে লাল লণ্ঠন। তার কারণ হল, বোমা যদি না ফাটে অমনি লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লাল লণ্ঠন তুলে ধরা হবে। লাল আলো দেখে গাড়ি থামবে। গাড়ি থামলেই দুদিক থেকে দুই রিভলভার নিয়ে হেমচন্দ্র আর প্রফুল্ল উঠে পড়বে লাটসাহেবের কামরায়। তারপর বিস্ফোরণ। তারপর আর্তনাদ। কামরার মধ্যে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। মহামান্য লাটসাহেব মহাপ্রয়াণের পর শুধু একটা লাস।

কিন্তু ফুলারের কপালে ছিল পরমায়ুর জোর।

রংপুরে খবর পৌঁছল, লাটসাহেব এ পাড়া মাড়াচ্ছেন না। স্টীমারে চেপে তিনি পাড়ি দিয়েছেন গোয়ালন্দে। সেখানে পূর্ববঙ্গ বাসীর কাছ থেকে শেষ বিদায়ের সাদর সম্বর্ধনা মালাটি গলায় টাঙিয়ে তিনি যাত্রা করবেন বোম্বাই দিয়ে বিলেত।

হেমচন্দ্র আর প্রফুল্ল দে ছুট, দে ছুট গোয়ালন্দের দিকে। বিপর্যস্ত বারীন্দ্র একা ফিরে এলেন কলকাতায়।

গোয়ালন্দে গিয়ে হেমচন্দ্ররা শুনলে পূর্ববঙ্গে বন্যা। তাই বিদায় অনুষ্ঠান বন্ধ। লাটসাহেব এখন যাবেন কলকাতায়।

দুই বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গে চেপে বসলেন কলকাতার গাড়িতে।

নৈহাটী স্টেশনে একি কাণ্ড! এত লাল পাগড়ী কেন সারে

সারে? ওঃ, লাটসাহেব আসছেন। নৈহাটীতেই যদি এমন সাজ সাজ রব, শিয়ালদায় তো তাহলে তুলকালাম কাণ্ড! দরকার নেই শিয়ালদয়ে গিয়ে। এই নৈহাটীতেই নেমে পড়া যাক। এখানেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে যাক শেষ রাত্রে। ঐ তো গাড়ি আসছে। দুই বিপ্লবী যে যার রিভলভারে হাত দিলেন। গাড়ি থামল। রিভলভার উদ্যত। গাড়ি কেন নড়ে না আর। রিভলভারে আঙুলগুলো ফুঁসছে। হঠাৎ ঘণ্টা বাজল। রিভলভারের নোয়ানো মাথা আবার সিধে।

গাড়ি ছাড়ল, রিভলভার রেডী।

কিন্তু একি ব্যাপার। গাড়ি তো কই কলকাতার দিকে আসছে না। ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে যে, আর লাল পাগড়ীরা একে একে ফিরে যাচ্ছে যে যার ডেরায়। যাবে না? লাটসাহেব যে নৈহাটী থেকে ফিরে গেলেন বোম্বায়ে। কলকাতায় এলেন না আর।

হেমচন্দ্রদের কলকাতায় ফিরে আসতে হল।

অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র সব কথা শুনলেন। অবিচলিত অরবিন্দ বললেন, যাও, যে যার বাড়িতে ফিরে যাও।

বিক্ষুব্ধ বারীন্দ্র বললেন, দাঁড়াও। ও ব্যাটাকে ছাড়ান নেই। দরকার হলে আমরা লণ্ডন পর্যন্ত যাব।

হিমকণ্ঠে হেমচন্দ্র বুঝি মনে করিয়ে দিলেন, টাকা?

ঐ এক কথাতেই ফুটন্ত বারীন্দ্র যেন শীতল বারি। কিন্তু তার মনের চাঞ্চল্য? সে বুঝি বীরের বিষাদের সঙ্গে তুলনীয়।

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা; সাবাসি, দূত। তোর কথা শুনি
কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?

যাকে বধ করা নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ফুলার সাহেব, শুনলে অবাক হতে হয়, একদা ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। কিন্তু কার্জন তাঁকে যে মুহূর্তে গদী পেতে দিলেন পূর্ববঙ্গে, অমনি ফুলার কলা গাছের মত ফুলে উঠলেন ক্ষমতার দাপটে। এবার সেই ফুলার বৃত্তান্ত।

গদীয়ান হতে না হতেই ফুলার সাহেবের দুই রানী। সুয়ো আর দুয়ো। এ কোন ইতিহাস লেখকের ভাষ্য নয়। স্বয়ং ফুলার সাহেবের ভাষণ।

১৯০৫। কূটনীতির বলে, ভেদনীতির ছলে বাংলাকে কেটে দু'টুকরো করলেন কার্জন। দেশবাসীর প্রচণ্ড প্রতিবাদেও তাঁর চণ্ডনীতির চক্রান্তকে থামানো গেল না। বঙ্গভঙ্গের পর নতুন-গড়ে-ওঠা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হল ঢাকা। তার লাট-বাহাদুর সাজানো হল ফুলার সাহেবকে। স্যার বামফীল্ড ফুলার গদীয়ান হয়েই গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রজাবৃন্দের কাছে ঘোষণা করলেন আপন প্রেম-কাহিনী। আমার দুই রানী। সুয়ো আর দুয়ো। মুসলমানেরা সুয়োরানী, অর্থাৎ শ্রেয় রানী। হিন্দুরা দুয়ো রানী অর্থাৎ হেয় রানী। একজন আমার চোখের মণি। আরেকজন চোখের বালি। দু'জনেই পরমাসুন্দরী, তন্বী-তরুণী। তবুও একজনকেই তো হৃদয়ের আসন পেতে দিয়েছি, তার কারণ অপরজন বড় মুখরা, বড্ড রূঢ়।

"আই সেড, দ্যাট আই ওয়াজ লাইক এ ম্যান হু ওয়াজ ম্যারেড টু টু ওয়াইভ্‌স, ওয়ান এ হিন্দু দি আদার এ মহামেডান—বোথ আর ইয়ং অ্যাণ্ড চার্মিং—বাট ওয়াজ ফোর্স্‌ড ইনটু দি আর্মস অফ ওয়ান অফ 'সেম বাই দি রুডনেস অব দি আদার।"

সত্যিই দুয়ো রানীর বেজায় দোষ। দুয়োরানী চায় সুয়োরানীর সঙ্গে মিলেমিশে সুখের সংসার গড়তে। যেহেতু তাদের ভাষা এক, এক তাদের জন্মভূমি, এক মাথার উপরের আকাশ, পায়ের তলার মাটি। সবার উপরে এক তাদের জ্বালা! তারা পরাধীন। এ সব

ভাবাটাই শুধু দুয়োরানীর দোষ নয়। সে এমন বেয়াড়া যে, ফুলার সাহেবের মুখের উপর জোরালো ভাষায় জানিয়ে দিতেও কসুর করেনি যে, যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রদ করা না হয় ততদিন তারা চালিয়ে যাবে সংগ্রাম। বয়কট করবে ফুলার সাহেবের দেশের বসন-ব্যসন, ফুলার সাহেবের জাতভাইদের তৈরী স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত সব কিছু।

রাগের বশে শুধু যদি মুখ ঝামটা দিয়েই দুয়োরানী থেমে যেত ফুলার সাহেব এতটুকুও বিরক্ত-আরক্ত হতেন না। কিন্তু দুয়োরানীটা দজ্জালের একশেষ। যেমনটি তার মুখে বলা, তেমনটিই কাজে করা। ফুলার সাহেব যেটি বলেন, কোরো না, দুয়োরানীর ঠিক সেটি করতেই বেশী জেদ। সাহেব বললেন—বন্দেমাতরম্ বোলো না। দুয়োরানীর সেইটিই হয়ে উঠল দিন রাতের বীজমন্ত্র। সাহেব বললেন—বিদেশী কাপড় পুড়িও না। দুয়োরানীর হাতে অমনি জ্বলে উঠল লাল আগুনের শিখা। সাহেব বললেন—খবরদার, কেউ যেন স্কুল-কলেজ কামাই করে স্বদেশী দলে যোগ না দেয়। দুয়োরানীর ছেলেরা তো পা বাড়িয়েই আছে মিছিলে হাঁটবে বলে। যত দেখেন, ততই যেন রাগে রোঁয়া ফুলতে থাকে ফুলার সাহেবের। রোষ-কষায়িত চোখে জ্বলতে থাকে প্রতিশোধের আগুন। ঝোপ বুঝলেই মারবেন কোপ। দুয়োরানীর জীবনকে করে তুলবেন শাসন-পেষণে দুঃসহ। তা যদি না পারি, তাহলে—

"কি সুখ ভুঞ্জিব
যতদিন নাহি তারে সংহারি-সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?"

ছোটখাট উৎপীড়ন চলেছিল অনেকদিন থেকেই। লঘু অপরাধে শুরু হল গুরু দণ্ড। দুয়োরানীও তেমনি দামাল। লঘু দণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘটিয়ে তোলে গুরুতর ঘটনা।

রংপুরের দুটো স্কুলের ছাত্ররা যোগ দিয়েছিলো স্বদেশী-সভায়।

গেয়েছিল বন্দেমাতরম্। মিঃ টি ইমার্সন হলেন গিয়ে ফুলার সাহেবের চেলা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি তখুনি হুকুমজারী করলেন সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি ছাত্রকে দিতে হবে মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে জরিমানা। ব্যতিক্রম ঘটলেই বহিষ্কার। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল রংপুরের অভিভাবকেরা। তারা ডাকলে জনসভা। সেই জনসভায় স্থির হল এখন থেকে তারা নিজেরাই গড়বেন নিজেদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার স্বদেশী বিদ্যালয়। রংপুরের সর্বজনপ্রিয় উকীল উমেশচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর নেতৃত্বে সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে প্রথম জন্ম নিল জাতীয় বিদ্যালয়।

রংপুরের এই সাহসী-উদ্যোগ সেদিন সারা বাংলাদেশে জোগাল অসীম উদ্যম। "রংপুরই হচ্ছে বাংলার শিক্ষা-স্বরাজ্যের প্রবর্তক।" এই বলে রংপুরকে সম্মান জানালেন বিনয় সরকার।

রংপুরের ছাত্র-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলকাতায় গোলদীঘিতে ডাকা হল জনসভা। উদ্যোগী কলকাতার ছাত্র সমাজ। তারাও সেদিন তৈরী জাতীয় বিদ্যালয়ের দাবীতে সরকারী বিদ্যালয়ের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে। "এই শতাব্দীর ছাত্র-আন্দোলন এই সভাতেই শুরু হয়।"

রংপুরের ঘটনার পর ফুলার-শাসিত পূর্ববঙ্গে উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশ হয়ে উঠল বর্বর বেপরোয়া। যে কোন একটা ছুতো-নাতা পেলেই হল। তার থেকেই শুরু হয়ে যায় তুমুল পুলিশী-তাণ্ডব। কোথাও সামান্য একটু স্বদেশীয়ানার গন্ধ পেলেই ফুলার সাহেবের বিষের ফণা অমনি উঁচু। অমনি ডাক পড়ে গুর্খা সৈন্যদের।

> সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে
> কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ—"এ কনক পুরে
> ধনুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি

চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিরে ভুলিতে!"

দশ-এগার বছরের একরত্তি একটা ছেলে। কালেকটারী গেটের সামনে এনে তার ওপর শুরু হল অমানুষিক বেত্রাঘাত। কারণ? কারণ ছেলেটা তার নিজের বাড়ির রান্নাঘরে বসে গাইছিল 'বন্দেমাতরম্'। লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটল দু'জন ময়রার। অপরাধ? অপরাধ তারা দোকানে ঝুলিয়েছিল স্বদেশী নোটিশ। সরকারী অপিসে শুরু হল ছাঁটাই-পর্ব। যাদের ওপর যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহ, তাদের সরাও। যারা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা সে প্রকাশ্যেই হোক গোপনেই হোক সেই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ওপর নোটিশ-জারী,—১৫ দিনের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। দেখতে দেখতে গুর্খাতঙ্ক এমন প্রকট হয়ে উঠল যে সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে-দোরে খিল। দরজার বাইরে পা বাড়াতে মেয়েদের চোখে-মুখে নির্যাতনের আতঙ্ক। দিনরাত্রি সে এক ভয়াবহ অত্যাচারের বিভীষিকা।

এর কিছুকাল পরে বরিশাল কনফারেন্স। পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলারই যেখানে যত স্বদেশ-প্রেমিক নেতা, সবাই সমবেত বরিশালে। বরিশাল সেদিন বীরভূমি যেন।

কনফারেন্স শুরু হবে। কিন্তু গোড়াতেই বাধল সরকারের সঙ্গে সংঘাত। সরকার-পক্ষে কড়া নোটিশ শান-দেওয়া খাঁড়ার মত ঝুলতে লাগল বরিশালের মাথার উপর—বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করা চলবে না। অন্যদিকে নেতারা নিশ্চিত-প্রত্যয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তাঁরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতেই সভাস্থলে যাবেন।

অবশেষে একদিন এল সেই সভারম্ভের ঐতিহাসিক লগ্ন।

শুরু হল শোভাযাত্রা। পুরোভাগে শকট। তাতে রয়েছেন সম্মেলনের সভাপতি আবদুল রসুল, সস্ত্রীক। এবং আবদুল হালিম গজনাভি। শকটের পিছনে দেশের বরণীয় বীরবৃন্দ। সুরেন্দ্রনাথ,

মতিলাল রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণ-কুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তার পিছনে জনসমুদ্র।

এগিয়ে চলেছে রাজকীয় শোভাযাত্রা। এই সময় রাজা বাহাদুরের হাবিলী থেকে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যরা বেরিয়ে এল রাজপথে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। যেই তাদের বেরিয়ে আসা অমনি—

"বাজিল রাক্ষস বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে রাক্ষস ;—"

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব। ছিলেন অশ্বারোহী। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রার উপরে ছুটিয়ে দিলেন নিজের খ্যাপা ঘোড়া। চারদিক থেকে ছুটে এল পুলিশের উদ্যত লাঠি। বর্বর নখদন্তে সরকারী শাসনের উগ্র নীতি বুনো জন্তুর মত লাফিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনতার উপর। ঠিক যেমনটি নির্দেশ ছিল জঙ্গীলাট ফুলারের।

ফুলার সাহেব বরিশাল কনফারেন্সের প্রথম শুভারম্ভের দিনে বোধহয় একটি কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন। তার প্রত্যেকটি অক্ষর হবে রক্তাক্ত। তাঁর সেই শত্রু-দমন কাব্যের ছন্দ হবে অমিত্রাক্ষর। এবং সে কাব্যগ্রন্থের নাম হবে মেঘনাদবধ কাব্য।

কাব্য-রচনার কাজ এগিয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছুদূর। বরিশালের মাটিতে বীরবাহুদের পতনের জন্যে সরকারী হিংসাকে যতটা হিংস্র হতে হয়, তার আয়োজন ছিল ষোড়শোপচারে সাজানো।

বাতাসে কান্না। মাটিতে রক্ত। নেতারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত। কর্মীরা প্রস্তুত। নিরস্ত্র জনতা রক্তাক্ত। বরিশাল সম্মেলনের শুভারম্ভ এই অত্যাচারের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে।

বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে চিত্তরঞ্জন। ছিল শোভাযাত্রার অংশীদার। পুলিশ মারতে মারতে তাকে টেনে এনে ফেললে পুকুরের মধ্যে। একগলা জলের মধ্যে যখন তখনও

চিত্তরঞ্জনের উপর চলেছে পুলিশী লাঠির মার। চিত্তরঞ্জন তবুও নির্ভয় চিত্তে সবেগে উচ্চারণ করে চলেছে নিষিদ্ধ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। মারের চোটে ক্রমশ সংজ্ঞাহীন হয়ে এল শরীর। সেই দুর্বিনীত যুবকের মৃত্যু হতে মাত্র মুহূর্তকাল বাকী এই অনুকম্পায় পুলিশ তাকে সেই আকণ্ঠ জলের মধ্যে ফেলে রেখে হাতের লাঠি গুটিয়ে নিলে। কিন্তু ফুলার সাহেবের অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, এত ভয়াবহ পীড়নেও বীরবাহুর পতন হল না। চিত্তরঞ্জন তার সঙ্গীদের সেবায় আবার ফিরে পেল সংজ্ঞা।

পুলিশী-পীড়নকে অগ্রাহ্য করে বরিশাল কনফারেন্স শুরু হয়ে গেছে। অশ্বিনী দত্ত প্রমুখ কয়েকজন নেতা অনুপস্থিত। তাঁরা তখন রাজবন্দী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্তের লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনালেন তাঁর সহকর্মী। তারপর কয়েকজন বক্তার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা। তারপরই এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শী সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনায় রয়েছে সেই দৃশ্যের জীবন্ত ছবি।

"সভায় এসে দাঁড়ালেন বাবু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। সঙ্গে পুত্র চিত্তরঞ্জন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। পিতা ও পুত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পিতা বলে চলেছেন পুত্রের প্রতি নির্যাতনের নিষ্ঠুর কাহিনী। পুত্রের গায়ে বর্বর আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন। এই দৃশ্য কখনো ভোলার নয়। পরে এই দৃশ্যকে রূপ দেওয়া হয়েছিল একটা ছবিতে। ১৯০৬-এর কলকাতা প্রদর্শনীতে সেটা ছিল একটা জনপ্রিয় দর্শনীয় বস্তু। লর্ড মিণ্টো উদ্বোধন করেছিলেন সেই প্রদর্শনী।

পাশাপাশি মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন সংগ্রামী দুই সৈনিক। পিতা ও পুত্র। পুত্রের আঘাতে ম্রিয়মাণ নন পিতা। পুত্রের গৌরবে মহীয়ান। সভামঞ্চে তিনি ঘোষণা করলেন—

"বাল্যকালে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিবার সময় দুইটি ছত্র আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। পুত্রশোকাতুর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ ধুলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ সে শয়নে
সদা ! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে—ভীরু সে মূঢ়—শত ধিক্ তারে ।"

আজ পুলিশের হাতে আমার পুত্রকে নিগৃহীত দেখিয়া এবং ধূল্যবলুণ্ঠিত এই সমস্ত বালকদিগকে দেখিয়া আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে—

"যে শয্যায় আজি তুমি রয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ সে শয়নে
সদা ।"

দেশের জন্য যদি আমার পুত্রের মৃত্যু হইত তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না। চিতু আমাকে বলিয়াছে, 'বাবা লাঠির ভয়ে আমি বন্দেমাতরম্ বলা ছাড়ি নাই। পুলিশ যতবার লাঠি মেরেছে আমি ততবারই বন্দেমাতরম্ বলেছি। পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণে যে কী গভীর আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।"

মনোরঞ্জনবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই সমস্ত সম্মেলন, সমস্ত সম্মিলিত জনতার অন্তঃকরণ থেকে গর্জে উঠল তুমুল জয়ধ্বনি, বরিশালকে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে। সেই মুহূর্তে বোধহয় ফুলার সাহেব একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো একটু স্তম্ভিতও। পতিত বীরবাহুরা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে—এমন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। উঃ, দুয়োরানীর ছেলেগুলো ভয়ানক রকমের মৃত্যুহীন।

হায়! কি সুখ ভুঞ্জিব ?

রক্তের কালি, পুলিশী লাঠির কলম, গুর্খাতঙ্কে ভীত বরিশালের বুক জোড়া ফ্যাকাশে সাদা কাগজ—সব আয়োজনই সাহেবের হাতের সামনে হাজির করে দিয়েছিল অনুগতের দল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস ফুলার সাহেবের কবিতা লেখা আর হল না।

আলিপুরের সেকসপীয়র ও অরবিন্দ ঘোষ

ওহে ওটা কি ?

—আজ্ঞে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো।

—ছেঁড়া কাগজ ? কই, দেখি দেখি।

আলিপুরের সেকসপীয়র বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোর উপর। চোখ দুটো তখন জ্বলন্ত সার্চলাইট। মুখে দুর্জয় দৃঢ়তা। মনে দুরন্ত আশা। ছেঁড়া কাগজের টুকরোটাকে উল্টে-পাল্টে তন্ন তন্ন করে চলেছে তাঁর তল্লাস। এরই এক কোণে হয়তো এমন কিছু লেখা, এমন কোনো সংকেত মিললেও মিলতে পারে যার ফলে বার্লি সাহেবের দরবারে দাঁড়িয়ে স্বগর্বে ঘোষণা করা যাবে—

—এই দেখুন স্যার, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যকে উচ্ছন্নে পাঠানোর আর এক জলজ্যান্ত নমুনা।

আলিপুরের সেক্সপীয়র অতি তীক্ষ্ণধী। এক মুঠো ছাই পেলেও তিনি উড়িয়ে দেখেন—যদি মিলে যায় কোন মাণিক-রতন। শত্রুকে বিশ্বাস কি ? হয়তো ঐ ছাইয়ের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছে দেশজোড়া বিদ্রোহের আগুন। তাই তুচ্ছ বলে কোন কিছুকেই হেলা-ফেলা করতে রাজী নন। একটা সামান্য চিরকুট হলেও সেটার ওপর তাঁর শ্যেন দৃষ্টি।

এই রকম শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে ক্লার্ক সাহেবও একদিন ঝুঁকে পড়েছিলেন এক ঢেলা মাটির উপর যেদিন গ্রে-স্ট্রীটের বাসায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপদজনক বিপ্লবী অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন তিনি।

—ওহে, ওটা কি ?

—আজ্ঞে মাটি। কার্ডবোর্ডের একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে রয়েছে।

—দেখি দেখি।

পুলিশ বাহিনীর সকলেই ঝুঁকে পড়লেন মাটির উপর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, সহকারী পুলিশ ইনস্পেক্টার বিনোদকুমার গুপ্ত, তাঁর সহযোগীরা এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। স্বয়ং ইনস্পেক্টার ক্লার্ক সাহেব তো আছেন। মাটির ডেলা উল্টেপাল্টে দেখেও কারুর বিশ্বাস হল না যে এটা সত্যিই মাটি। সকলেরই মনে ঘোরতর সন্দেহ—এ নিশ্চয়ই 'ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট কোন স্ফোটক পদার্থ।' অতএব পাঠানো হোক রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাঠানো হয় নি। মনে মনে মাটি বলেই সেটাকে মেনে নিয়েছিলেন সবাই। মনে মনে তাঁরা ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন নিশ্চয়ই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বোমার বদলে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাটির ডেলা নিয়ে এতটা বিব্রত হওয়ার জন্যে।

তবু রাজদ্রোহী-দমন কিংবা দলন যাঁদের পবিত্র ব্রত, তাঁদের

এমন বিব্রত হওয়াটাই কর্ম-নৈপুণ্যের নমুনা। আলিপুরের সেক্‌সপীয়রও সেই একই কারণে কয়েকদিন যাবৎ বড়ই বিব্রত হয়ে রয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ভাষায় 'এ ফ্যানাটিক এণ্ড এ ব্যাড বোল্ড ম্যান' অরবিন্দকে অমার্জনীয় রাজদ্রোহের অপরাধে ঘায়েল করার পঞ্চশর অর্থাৎ পাঁচটি মারাত্মক প্রমাণ তাঁর হস্তগত। কিন্তু আরো কিছু চাই। আরো সুস্পষ্ট সোচ্চার, সহজতর প্রমাণ। মজঃফর-পুরের মাটিকে রক্তাক্ত করে যে বোমা ফেটেছে সেই বোমা তৈরীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যাতে প্রমাণিত হবে অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তিনিই দেশজোড়া হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা। ইংরেজ বিরোধী দক্ষযজ্ঞে তিনিই প্রলয়নাচনের মহাবিদ্রোহী মহাদেব।

অরবিন্দের আপন-কথা এই প্রসঙ্গে অপরূপ।

"যেমন মিল্টনের Paradise Lost এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের Plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man. আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা পিতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি। এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে, আমি ধরা না পড়িলে বোধহয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহা খুশী হইতেন এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয়

তখনই মুক্তিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমার কারাবাসের সময় ও গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত হইত।"

অরবিন্দ-কথিত অবিরাম ধ্যানের ফলে আলিপুরের সেক্‌সপীয়র নর্টন সাহেব সত্যি সত্যিই একদিন ছাই-এর স্তূপ ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন মহামূল্য মাণিক। এই মাণিকই প্রমাণ করে দেবে যার মাথায় সেটি ছিল তার কতবড় চক্রাকার ফণা, কী ভীষণ চক্রান্তের অন্ধকার গহ্বরে তার বাস।

শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠতম প্রমাণ হাতে পেয়ে আলিপুরের সেক্‌সপীয়র সাহেব আহ্লাদে আটখানা। প্রমাণ একটি চিঠি। আকারে অসম্ভব লঘু। যেন এক চিলতে মেঘ। কিন্তু গুরুত্ব বিশাল। কেননা সেই মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কালবোশেখীর ভয়াবহ ঝড়ের ইঙ্গিত।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেবের আদালতে দাঁড়িয়ে আলিপুরের সেক্‌সপীয়র সাহেব একদিন সগর্বে ঘোষণা করলেন—মহামাণ্য বিচারক এই দেখুন ষড়যন্ত্রের ষষ্ঠতম মমুনা। একটি মারাত্মক চিঠি।

বিচারক চিঠিটি পড়লেন। অরবিন্দকে লেখা বারীন্দ্রকুমারের একটি সংক্ষিপ্ততম চিঠি। ভাষা ইংরেজী।

প্রিয় দাদা, এখনই সময়। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্যে আমাদের ভারতের সর্বত্র মিঠাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে। আমাদের কনফারেন্সের জন্য ব্যবস্থা যাতে হয় তা দেখো। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলাম।

তোমার স্নেহের বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

চিঠি পড়ে বার্লি সাহেবের ভ্রূযুগল প্রশ্ন-চিহ্নের আকারে কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

চিঠি তো পড়লাম। কিন্তু এর মধ্যে ষড়যন্ত্র কোথায়?

—কেন, ঐ যে মিঠাই।

—মিঠাই? মিঠাই মানে?

—বোমা।

এইখানে সেক্‌সপীয়র্‌ সাহেবের কল্পনাশক্তির সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের আত্মকথা প্রায় অমৃত সমান।

"হলিংশেড হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্‌সপীয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ রাখিয়াছিলেন, পুলিশ তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্‌সপীয়র নর্টন সাহেব। তবে সেক্‌সপীয়রে ও নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্‌সপীয়র, সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন নর্টন সাহেব ভালমন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনো অনীয়ান, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর Suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর Plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্‌সপীয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে যেমন ফলস্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনি নর্টনের Plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশ মণ অনুমান ও Suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও Plot-এর পারিপাট্য ও রচনাকৌশল প্রশংসা করতে বাধ্য।"

আলিপুরের সেক্‌সপীয়র অর্থাৎ নর্টন সাহেব সরকার পক্ষের কৌঁসুলী। দৈনন্দিন হাজার টাকা তাঁর বেতন। তদুপোযোগী তাঁর দাপট। আলিপুর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেব পর্যন্ত তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ, পরাক্রমে পরাভূত ও সন্ত্রস্ত। অরবিন্দের কলমে এই বার্লি-বন্দনা রস-রচনার একটি নিখুঁত নিদর্শন।

"নর্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লিকে নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক বা Patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বার্লি সাহেব বোধ হয় স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কটল্যাণ্ডের স্মারক চিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা,

অতি রোগা দীর্ঘ দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্‌টারলোনী মনুমেণ্টের উপর ক্ষুদ্র অক্‌টারলোনী বসিয়া আছেন বা ক্লিয়পাত্রার ebelisk-এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূসর বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটল্যাণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি-স্বষ্টির সময়ে প্রকৃতিদেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room "ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের অসীম ধন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব উদয় হয় infinine rooms in little riches. বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরনের অল্পসংখ্যক শাসনকর্তা দ্বারা ত্রিশ কোটী ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরেজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত।....প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মীতায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীতভাবে নর্টনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নর্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন যে এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য-ভাব মনে আবির্ভূত হইত।"

একা রামে রক্ষে নেই, তার উপর সুগ্রীব দোসর। সুতরাং মিঠাই মানে যে বোমা তাতে আর আদালতের সন্দেহ থাকার কণামাত্র কারণ ছিল না। কিন্তু নর্টন-রচিত মোকদ্দমা-নাটকের মাঝপথে আবির্ভাব ঘটল এক অবাঞ্ছিত চরিত্রের। তিনি আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার। নাম চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর অমোঘ যুক্তিজালে মহাপরাক্রমশালী নর্টন-সিংহ বাঁধা পড়লেন। 'মিঠাইয়ের চিঠি' নামে

খ্যাত যে-চিঠিকে নর্টন সাহেব অরবিন্দ-বধের চরম ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্যে গাণ্ডীবে টংকার দিয়ে বসেছিলেন, চিত্তরঞ্জন নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দিলেন, সেই মহামূল্য চিঠিখানা আদ্যোপান্ত জাল। কেঁচোর মুখে নুন পড়ার মত কুঁচকে গেলেন নর্টন সাহেব।

—জাল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তার কারণ একাধিক। চিঠিখানা যাঁকে লেখা হচ্ছে, এবং যিনি লিখছেন তাঁরা দুজনেই তখন সুরাটে। সুতরাং চিঠি লেখার কোনও প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত বারীন্দ্র সব সময়ে অরবিন্দকে 'সেজদা' সম্বোধন করে এসেছে। প্রিয় দাদা কখনো লেখেনি। তৃতীয়ত চিঠির নীচে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পুরো নামটা অস্বাভাবিক। চতুর্থত এই রকম একটা মারাত্মক চিঠি অরবিন্দ মীরাট থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন, চিঠিটা ছ মাস রইলো তাঁর স্কট লেনের বাসায়, তারপর তিনি সেটাকে তাঁর গ্রে স্ট্রিটের নতুন বাসায় সযত্নে সঞ্চিত করে রাখলেন এরকম ঘটনা অসম্ভব। পঞ্চমত খানাতল্লাসীর সময়েই এ চিঠিটা পাওয়া গেছে কিনা তার প্রমাণ নেই।

আলিপুর মামলা থেকে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন অচিরাৎ। বিচারক বিচক্রফ্‌ট সাহেব ঘোষণা করলেন অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে সব সাক্ষাৎ-প্রমাণ দাখিল করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। অতএব আসামী নির্দোষ।

অরবিন্দের মুক্তিতে সারাদেশে আনন্দের ঝড় উঠলো। কিন্তু সেই উল্লসিত ঝড়ের মধ্যে বুঝি একজনই ফেলেছিলেন একটি সকৌতুক দীর্ঘশ্বাস। তিনি স্বয়ং অরবিন্দ। "সেশনস্ আদালতে আমি নির্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন-কৃত Plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বিচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন।"

অরবিন্দকে ধন্যবাদ। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় সেক্সপীয়রটি আমাদের হাতে অথবা সাহিত্যে তাঁরই বিদগ্ধ মননের দান।

রবীন্দ্র-সংগীত ও উল্লাসকর

মাথার উপরে মৃত্যুর খড়গ। তবু ভয় নেই। যে কোন দিন জারী হতে পারে ফাঁসির হুকুম। তবু মুখে প্রশান্ত হাসি। জেল-খানার বদ্ধ পরিবেশে বন্দী। তবু গলায় স্বতঃস্ফূর্ত গান। কি গান? স্বদেশপ্রেমের। কার গান—রবীন্দ্রনাথের। গান অনেকেই গাইতো। কিন্তু সবচেয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বর কার? বলাবাহুল্য, উল্লাসকরের। সে কি? বোমা বানাতে বানাতে উল্লাসকর আবার গান শিখলো কখন? কি করে? কার কাছে? ইতিহাসে এর কোন সাক্ষ্য নেই। তাহলে বোধহয় বাতাসের কাছ থেকে শিখেছে। কারণ তখন বাংলাদেশের বাতাসের স্তরে স্তরে ছেয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের প্রাণ-রাঙানো ভয়-ভাঙানো সুর। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা

বাবদে তখন নিয়মিত আসতেন ডন সোসাইটিতে প্রায় প্রতিদিনই। সেইসঙ্গে সোসাইটির ছাত্রদের তালিম দিতেন স্বরচিত স্বদেশী গানের। বিখ্যাত বিনয় সরকার, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জি, প্রমুখেরা হচ্ছেন ছাত্র। যেদিন নিজে আসতে পারতেন না, তাঁর বদলে "তাঁর অন্যতম বড় চেলা" অজিত চক্রবর্তী। বিনয় সরকারী ভাষায় "মেট্রোপলিটন কলেজে চোঁআড়ে গলায়, গাধার গলায়, ফাটা গলায়, মিহি গলায়, সর্দি গলায় অ-সুরেরা সুর সাধনা করত।"

উল্লাসকর ডন সোসাইটির ছাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে গান শেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। গা'ন শেখার সময়ই বা কোথায়? প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে গোপনে বোমা বানানোর ধ্যানেই তার জীবনের অষ্টপ্রহর মগ্ন। সে যে বিপ্লবী' ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের লৌহ বন্ধন থেকে মুক্ত করাই তার চোখের স্বপ্ন, বুকের আকাঙ্ক্ষা, রক্তের বাসনা। তাকে বিপ্লবী হওয়ার প্রেরণা দিল কে? ভিতর থেকে হয়তো প্রেরণা যুগিয়েছিল দেশের দুর্দশা। কিন্তু বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথই।

সেটা ছিল ১৯০৪-এর জুলাই মাস। চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে সভা ডাকা হয়েছে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। সভাপতি, রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রধান বক্তা, রবীন্দ্রনাথ। সারা শহরে বার্তা রটে গেছে, রবীন্দ্রনাথ আজ যে প্রবন্ধ পড়বেন, তার নাম "স্বদেশী সমাজ"। স্বদেশী শব্দটি বাঙালীর কানে তখন একেবারে আনকোরা নতুন। স্বদেশী হওয়ার বাসনাটাও তখন বাঙালীর প্রাণে নতুন। তাই স্বভাবতই যেমন আশা করেছিলেন সভার উদ্যোক্তরা, তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশী ভিড়ে উদ্বেল হয়ে উঠল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তর। এত ঢেউ যে ঘরের ভিতরে আঁটল না। ঘর ছাপিয়ে উপছে পড়ল বাইরে। বাইরেও এত বিপুল স্রোত যে শেষ পর্যন্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে ছুটে এল ঘোড়সওয়ার পুলিশ, বাধল পুলিশ বনাম জনতার সংঘর্ষ।

সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল কিশোর উল্লাসকর। উল্লাসকর ছিল

তাদেরই একজন যারা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের বন্ধ দরজা। ঢুকতে চেয়েছিল ভিতরে, স্বদেশী-সমাজ কিভাবে গড়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তারই মন্ত্রে দীক্ষা নেবে বলে। সেদিনের ভিড়ে উল্লাসকর ছিল তাদের মধ্যে প্রধান, যারা জনতার উপরে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বজ্র মুষ্টিতে। উল্লাসকরদের সঙ্গে সরাসরি হাতাতাতি হয় জনৈক সার্জণ্টের।

সেই থেকে শুরু। সেই থেকে বুকের পাঁজরে বজ্র জ্বালিয়ে নিয়ে বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা। তারপর মানিকতলার আমবাগান। তারপর বোমা তৈরীর গোপন প্রচেষ্টা। তারপর কিংসফোর্ডের বদলে ক্ষুদিরামদের বোমায় কেনেডী দম্পতির মৃত্যু। তারপর পুলিশী ধর-পাকড়। সবশেষে আলিপুরের বোমার মামলা। বন্দীদের মধ্যে রয়েছেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং উল্লাসকরও।

মাথার উপর মৃত্যুর খড়গ। তবু ভয় নেই। যে কোন দিন জারী হতে পারে ফাঁসির হুকুম। তবু মুখে প্রশান্ত হাসি। জেলখানার বন্ধ পরিবেশে বন্দী। তবু গলায় স্বতঃস্ফূর্ত গান। এই হল উল্লাসকর।

জেল-জীবনে সহকর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে অরবিন্দ লিখেছেন—"সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত। কেহ কেহ বই পড়িত। কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতার মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত। কেহ কেহ খেলা করিত, যে দিন যে খেলা জোটে। আসক্তি কাহারও নাই। কোনদিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা। কোনদিন বা দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি, দিনকতক ফুটবল চলিল। ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব উপকরণে গঠিত। দিনকতক কানামাছি চলিল। এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎসু শিক্ষা, অন্যদিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ, আর একদিকে drafts বা দশ-পঁচিশ।....

সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেম দাস, যাঁহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না।"

গান গাইতো অনেকেই, কিন্তু সবচেয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বর কার? বলা-বাহুল্য, উল্লাসকরের। সত্যেন ও কানাই মারা গেছে ফাঁসিতে। অরবিন্দকে জড়ানো হয়েছে রাজদ্রোহের শক্ত গিঁটের ফাঁসে। সরকার পক্ষ এই শত্রুকুলকে নির্মূল করতে বর্বর নখদন্তে উদ্যত। উল্লাসকরের মুখে তখনও প্রশান্তি। কণ্ঠে তখনও গান।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন। তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছেন দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তিদানে। আহার-নিদ্রাহীন অক্লান্ত তাঁর পরিশ্রম। সমস্ত দেশ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে আলি-পুরের আদলেতের দিকে। সমস্ত দেশের মুখে একটি উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন। বোমার মামলায় ধৃত অরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীরা মুক্তি পাবে কি? এবং এই প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করছে মাত্র একজনের উপর। তিনি চিত্তরঞ্জন। তিনিও বন্দী। লৌহ শিকলে নয়। ব্রিটিশ-শাসক গোষ্ঠীর সপ্তরথী পরিবৃত ব্যূহে। এই ভীষণ সংগ্রামে তিনি একা। তাঁকে প্রেরণা দেবার বুঝি কেউ নেই। কারণ দেশ জুড়ে তখন পুলিশী ধর-পাকড়ের সন্ত্রাস। বুকের ব্যথা মুখের কথায় ব্যক্ত করবে, এমন লোকের সংখ্যা কম। এমনি ভগ্নোদ্যম অবস্থায় একদিন চিত্তরঞ্জন ইংরেজের আদালতে বসেই খুঁজে পেলেন ইংরেজে বিরুদ্ধে আইনের সংগ্রামের দুর্জয় প্রেরণা। প্রেরণা জাগালো কে? উল্লাসকর।

সেদিন তখনো আদালতে কাজ শুরু হয়নি। আসামীরা ডকে দাঁড়িয়েছে সবেমাত্র। সবেমাত্র সরকার পক্ষের কৌসুলী যথা নর্টন, বার্টন প্রভৃতিরা এসে বসেছেন যে যার আসনে। সার্জন ইনস্পেক্টররা

এসে দখল করেছেন যে-যার জায়গা, সশস্ত্র হাতে। এবার হাকিম আসবেত তাঁর খাসকামরা থেকে। হাকিম এসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেই চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়াবেন বক্তৃতা করতে। রোজই তাই ঘটে।

কিন্তু রোজ যা ঘটে সেদিন তা ঘটল না। অন্যদিন এই সময়ে আসামীরা ডকে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তাঁদের চোখ মুখের চাউনিতে ফুটে থাকে একটা অন্তহীন ঔদাসীন্য। কারো মুখের উপরে লেগে থাকা ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসি দেখে মনে হয় যেন মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে পরম উপভোগ্য জীবনে আর কিছুই নয়। কেউ বাজায় লোহার শিকল। কেউ কিছুই করে না। কেবল ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে কোন না কোন বিচারকের মহাগম্ভীর মুখের দিকে। কিন্তু সেদিন ঘটল অন্য ঘটনা।

সমস্ত আদালত গৃহকে স্পন্দিত করে হঠাৎ ধ্বনিত হল ভৈরবী সুরের এক সুললিত সংগীত। সমস্ত আদালত গৃহের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল নিমেষে। সমস্ত আদালত বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল গায়কের দিকে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উল্লাসকর ধরেছে তার উদাত্ত কণ্ঠের গান।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে........

হাকিম ছুটে এসে যদি হাতুড়ি পিটতেন টেবিলে, নর্টন, বার্টন নামক জাঁদরেল ব্যারিস্টারের দল যদি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতেন, সশস্ত্র প্রতিহারীর দল যদি গায়কের মুখের সামনে তুলে ধরতেন শাণিত অস্ত্র, গান হয়তো থেমে যেতো। কিন্তু তার বদলে সমস্ত আদালত গৃহ যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত শান্ত। উল্লাসকরের উদাত্তকণ্ঠ স্তরে স্তরে এগিয়ে চলেছে গানের শেষ কলির দিকে, তীর্থযাত্রী যেমন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় দেবতার স্বর্গীয় মহিমার দিকে, মৃত্যুভয় হারার দল যেমন করে এগিয়ে যায় দৃঢ়পদক্ষেপে মুক্তির সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে।

গান থামল। হাকিমও আড়াল থেকে শুনছিলেন গান। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করছিলেন নিজের কামরায়। গান থামলে তারপর তিনি এসে বসলেন নিজের আসনে। চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন বক্তৃতা দিতে। তখনও তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে ধ্বনিত হচ্ছে সেই গান। প্রতিটি রক্তবিন্দু তাঁকে সেদিন জোগাল এক প্রচণ্ড দুর্জয় মহৎ উদ্দীপনা। দেশপ্রেমিকদের বাঁচাতেই হবে।

মোচার ঘণ্ট ও হেমচন্দ্র কানুনগো

বারীন ঘোষ তো রেগেই লাল। ছ্যাখ, আমার দিদিমা হলো হাটখোলার দত্তবাড়ির মেয়ে। যাকে বলে পাকা রাঁধুনী। সুতরাং আমি যা বলছি সেটাই ঠিক।

হেমচন্দ্র ভ্রূক্ষেপহীন। নিজের মতে অনড় অটল।

আর এই দুই রাজার যুদ্ধে যে উলুখাগড়ার আধমরা অবস্থা, তিনি হলেন উপেন বাঁড়ুজ্যে। তাঁর হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা। না পারেন বারীন ঘোষকে চটাতে। না পারেন হেমচন্দ্রকে হটাতে। তাঁকে শ্যামও রাখতে হবে, কুলও। দু' নৌকোয় পা দিয়ে দুর্দশার একশেষ।

তিন জনের কনফারেন্স। ভিন্ন মুনির ভিন্ন মত। কেউ

বাঁয়ে ফিরতে রাজী নয়। হেমচন্দ্র সোজা ভাষায় জানিয়ে দিলেন—

ছাখ হে, আমি তোমাদের বাংলা দেশের হেঁসেলখানায় বসে রান্না-বান্না শিখিনি। শিখেছি খোদ ফ্রান্স থেকে। সুতরাং খোদার ওপর খোদকারী করতে এসো না। আমি যা বলছি সেটাই ঠিক। ঐ ফরমুলাতেই রান্না হবে।

অগত্যা ঢোক গিলে সবাইকে রাজী হতে হলো।

উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক, তখন আমরা স্থির করিলাম যে, মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদাদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম। হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন।"

শুরু হল মোচার ঘণ্ট। ঘটনাস্থল আন্দামানের জেলখানা, পোর্ট-ব্লেয়ারে। প্রশ্ন হল, জেলখানার ভিতরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামীরা মোচার ঘণ্ট রাঁধছে, এ আবার কেমন ধারা আজগুবী ব্যাপার? লপসী যাদের ললাটলিপি তাদের হাতে কড়া খুন্তি তেল নুন আনাজ তরকারী এল কোন্ মন্ত্রবলে?

মন্ত্রবলে নয়। বাহু বলে। অর্থাৎ সংগ্রামের পরিণামে। পোর্টব্লেয়ারে শুরু হয়েছিল একটানা ধর্মঘট। কয়েদীদের দাবি ছিল তিন দফা। চাই ভাল খাওয়া। চাই উদয়াস্ত অবিরাম পরিশ্রমের হাত থেকে অব্যাহতি। আর চাই পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার দেখাশোনার সুযোগ। যাদের কানে ঢুকবে বলে এইসব কথা, জেলখানার সেই সব কর্ণধারদের কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত নেই। ফলে শুরু হল হাঙ্গার স্ট্রাইক। কেউ ঘোরাবে না ঘানি। কেউ বানাবে না নারকেল ছোবড়ার দড়ি। কেউ ভাঙবে না রোদে পুড়তে পুড়তে আগুনে-পোড়া-ইঁট। কেউ খেতে রাজী নয় লপসী। জেলখানায় অন্ন-জল খানাপিনা বন্ধ।

ইন্দ্রভূষণ নামে একজন কয়েদী আত্মহত্যা করল উদ্বন্ধনে। উল্লাসকর রোদে বসে একটানা ইঁট ভাঙতে অপারগ। কারণ তাঁর শরীরটাই ভাঙা। এই কাজ-না-করার শাস্তি হিসেবে উল্লাসকরকে দেওয়া হল সাত দিনের দাঁড়া-হাতকড়ির সাজা। সাত দিন গেল না। প্রথম দিনেই জ্বরে জর্জর। পরের দিন জ্বর যখন ছাড়ল তখন দেখা গেল তিনি পরিপূর্ণ উন্মাদ। ননীগোপাল নামের একজন কয়েদীকে কাজ-না-করার শাস্তি হিসেবে পরতে দেওয়া হল চটের জাঙ্গিয়া। ননীগোপাল চটের জাঙ্গিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এই বলে যে, 'naked we come out of our mothers womb, and naked shall we return.'

নিজের কুঠরীতে সারাক্ষণ উলঙ্গ হয়েই রইলেন তিনি। নন্দগোপাল নামক একজন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় কয়েদী ঘানি ঘোরাতে রাজী না হওয়ায় তাঁর পায়ে পরানো হলো লোহার বেড়ী। অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে ফেলে রাখা হল তাঁর কুঠরীতে। এইসব অবর্ণনীয় অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আর্তনাদ-প্রতিবাদ শুনতে শুনতে রাজনৈতিক বন্দীদের ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে। ফলে আন্দোলন হয়ে উঠল জোরালো। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন থামানোর উৎপীড়নও হয়ে উঠল উগ্রতর। কিন্তু দমানো গেল না শেষ পর্যন্ত কাউকেই। তাঁরা অদম্য বিদ্রোহী। অবশেষে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল কিছুটা। শক্ত ঘাড় নত হল। তাঁরা এগিয়ে এলেন রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করতে। যাঁরা মেয়াদী কয়েদী, অর্থাৎ টার্ম কনভিক্ট স্থির হল তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাঁর যাঁর নিজের দেশের জেলখানায়। তাই করা হল। পোর্টব্লেয়ারে রইলেন কেবল আলিপুর মামলার বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ। ঢাকার পুলিন দাস, সুরেশচন্দ্র। আর নাসিক ষড়যন্ত্রের সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় আর যোশী।

যাঁরা রইলেন তাঁদের জন্যে বন্দোবস্ত করা হল কিছু সুযোগ

স্বাবধের। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় উপেন্দ্রনাথের কলমে তার বিবরণ হোলো।

"ধর্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল তাহার মোদ্দা কথা এই যে, আমাদের চৌদ্দ বৎসর কালাপানির জেলে বন্ধ থাকিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীদের মত পোশাক পরিতে পাইব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি। হাতকাটা কুর্তা না পরিয়া হাতাওয়ালা কুর্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকার পাইব। অধিকন্তু দশ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্মঘটে যোগ না দিই বা জেলের কর্তাদের সহিত ঝগড়া না করি তাহা হইলে দশ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কিনা ঃ জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া আট-হাতী মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল। হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল আর আমি হইলাম ঘানি ঘরের মোড়ল।"

আরও বহু বিখ্যাত কয়েদীর জীবনস্মৃতিতেও আন্দামান বাসের আহার-বিহার সংক্রান্ত কাহিনী ফুটে উঠেছে আরও তথ্যের, আরও সত্যের সমন্বয়ে। ঢাকার পুলিন দাস, মাটি কাঁপতো যাঁর লাঠির জোরে, প্রমাণহীন রাজদ্রোহের ক্ষমাহীন বিচারে তাঁকেও একদিন

'মহারাজা' জাহাজে চাপিয়ে চালান দেওয়া হলো আন্দামানে। দু'পায়ে লোহার বেড়ী। দুবেলা জনহীন কারাকক্ষে অবিশ্রাম অন্তহীন প্রহর গোনা। চোখের সামনে ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্বে অধঃ শুধু নির্দয় উদাসীন খাড়া দেয়ালের কঠিন আড়াল। আর মুখের সামনে ?

"আহারের ব্যবস্থা ছিল প্রাতে ফেনা ভাত, মধ্যাহ্নে দুই টুকরো রুটি, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাত, ডাল ও তরকারী ; বৈকালেও ঐরূপ। আমি আন্দামানে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বৎসর হইতে সপ্তাহে দুই দিন দধি দেওয়া হইত এবং কদাচিৎ বৎসরে দশ বার দিন মাছ দেওয়া হইত। কোন কোন দিন তরকারীর মধ্যে বন্যকচুর ডগা পাতা, মূল, দুর্বাঘাস ও অখাদ্য বন্য লতা-পাতাও সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত।....

আন্দামানে পাঁচ বৎসর অতীত হওয়ার পর তথাকার নিয়মানুসারে নিজের আহার্য নিজেই রন্ধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এবং প্রতি মাসে অতিরিক্ত বার আনা পাইতাম, তাহা দ্বারা গুড়, চিনি, বিভিন্ন মশলা ক্রয় করিতে পারিতাম। জেল-ওয়ার্ডার গণই বাহির হইতে এইসব জিনিস ক্রয় করিয়া আনিয়া দিত। যে সময় হইতে আমি জেল-প্রেসে কাজ করিতাম তখন হইতে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, সুরেশ সেন এবং আমি একসঙ্গে রান্না করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

বিভিন্ন কারণে বারীন ঘোষ জেল কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল এবং জেলারের নিকট হইতে প্রায়ই মাছ-মাংস ইত্যাদি উপহার পাইত। ভাগ্যক্রমে আমরাও উহার অংশ পাইতাম। মাঝে মাঝে লুচি বা মিষ্টান্ন করিবারও সুযোগ পাওয়া যাইত।"

বারীন ঘোষ বাইরে বিপ্লবী হলেও তাঁর ভিতরকার মানুষটা আলাদা। স্বভাবে কবি এবং প্রেমিক। মনের সাতটা তারে নানা সুর। আবাল্য ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নাই জুটুক, জুটেছিল অফুরন্ত স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা। সেই সংগে মাছের মুড়োটি, দুধের সরটি, সুতরাং বারীনের পক্ষে আন্দামানেরর জেল-জীবনে বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে

মাপা জোপা আহারের পুনরাবৃত্তিময় অভিজ্ঞতা কতখানি তিক্ত হওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

"খাইবার পরিবার দুঃখ প্রথম প্রথম দুঃসহ হয় নাই। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই প্রত্যহ ডাল ভাত ও কচু পাতা খাইবার একঘেয়ে ভাবটা কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। যতই দেশের জল হাওয়ার গুণ ঘুচিয়া আন্দামানী জল হাওয়ার গুণ ধরিয়া আসিল, ততই আহারে রুচি ও মনের স্বস্তি চলিয়া গেল। কাজেই আহার করিতে হইত নিতান্ত কর্তব্য বোধে ও ক্ষুধার তাড়নায়। সেই হেতু আহারের পরিমাণ যেরূপ মিতাচারে দাঁড়াইল তাহা যোগীজন-বাঞ্ছিত —এ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতে নিতান্তই আবশ্যকীয় শিক্ষা। ব্রাহ্মণের গরু শুনিয়াছি খায় কম, কিন্তু গোবর ও দুধ, দুইই বেশী পরিমাণে দেয়। আমাদেরও হইল গো-ব্রাহ্মণের অবস্থা, কয়েদী খায় কম, খাটে চতুর্গুণ। নিত্য একবেলার আহার্যের পরিমাণ—চাউল ৬ আউন্স, আটা ৫ আউন্স, ডাল ৩ আউন্স, লবণ এক ড্রাম, তৈল ৡ ড্রাম এবং তরকারী ৮ আউন্স। জেলে চিড়া-মুড়কীর এক দর। গুরুভোজী আধমণি কৈলাস এবং আমার মত কৃশ গঙ্গা ফড়িং উভয়ের জন্য সম পরিমাণ আহারের ব্যবস্থা।

তবে সুখের বিষয় আহার বড় একটা এদেশে করতে হয় না। পোর্টব্লেয়ারের ভাতজল কিছুকাল পেটে পড়িলেই ক্ষুধামান্দ্যের চরম দেখা দেয়। তাহার উপর যে চর্বচোষ্য পরমান্নের ব্যবস্থা, তাহাতে রুচি ও ক্ষুধা অচিরেই জবাব দিয়া বসে। দুই বৎসর একঘেয়ে কচু শাক ও অন্ন আহার করিয়া নূতন কিছু তুচ্ছ মিঠাই মণ্ডা যে কি অমৃতই বোধ হইত, তাহা কি বুঝাইব। একদিন সৈয়দ জব্বার নামে এক পাঠান ওয়ার্ডার রাত্রে পাহারার সময়ে আমার জন্য কিছু মাংস রাঁধিয়া গোপনে আনিয়া দিল, তাহার সুস্বাদ কখনও পাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদীর স্বহস্তপক্ক রন্ধনেও থাকে কিনা সন্দেহ। একদিন চার্লি বলিয়া এক পুরাতন কয়েদী রুটির সহিত চিনি ও টাটকা নারিকেলের তৈল

মাখিয়া আমাকে খাইতে দিল। বর্ধমানের মিহিদানায় সত্যসত্যই অমন সুস্বাদ কখনও পাই নাই। পোর্টব্লেয়ারে সেই দুঃখের দৈন্যের জীবনে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যাহারা সুখের শয্যায় লালিত হইয়া নিত্য বহু সুখাদ্য আহার করে তাহারা বড় কৃপার পাত্র। জিহ্বার আস্বাদন সুখে বঞ্চিত তাহাদের মত এ দুনিয়ায় আর কেহ নাই।"

যাই হোক, ধর্মঘটের ফলটা ভালই হলো। স্বাধীনতার আস্বাদন পুরোপুরি মিলুক না মিলুক, জিভের আস্বাদন সুখ মোটামুটি মিটবে এবার।

যে হাতে এতদিন ছিল বেড়ী, ধর্মঘটের ফলেই সেই হাতে উঠল হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি-কুড়ি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারাদিন ধরেই চলবে রান্নাবান্নার নামে ফুর্তির চড়ুইভাতি। জেলখানার নিয়মে রান্না-খাওয়া শেষ করতে হবে সকাল দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। সময়টা স্বল্প। সেজন্য ঠিক করা হল ভাত, ডাল এসব নেওয়া হতো সাধারণ ভাণ্ডার অর্থাৎ পাকশালা থেকে। কেবল তরকারীটাই রাঁধা হবে নিজেদের মনের মতো করে নিজেদের হাতে।

এই রান্নার সূত্রেই একদিন হাতে এল মোচা। আহা! কতদিন খাওয়া হয়নি মোচার ঘণ্ট। মোচার ঘণ্টের নাম শুনলেই জিভে আসে জল। চোখে ভাসে মা-মাসীমার হাসি খুশী স্নেহ-সজল মুখখানি। সে কি স্বাদ! সে কি সুখ!

মোচা যখন মিলেছে মোচার ঘণ্ট রাঁধতেই হবে। কিন্তু রাঁধবে কে? কার হাতে মোচার ঘণ্ট হয়ে উঠবে মধু-মাখা? কে জানে তার ফরমূলা?

ডাক পড়ল হেমচন্দ্রের। বসে গেল কনফারেন্স। তা, এত লোক থাকতে হেমচন্দ্রকে ডেকে এত পরামর্শ করা কেন? কারণ আছে বৈকি। কারণ হলো হেমচন্দ্র কানুনগোকে যে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে শেখার নামে ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল বোমা বানানোর ফরমূলা জেনে আসতে। তখন সেই সবে জমে উঠেছে যুগান্তরের

আড্ডা। তখন সেই সবে উঁকি দিয়েছে বাংলা দেশের আকাশে সন্ত্রাসবাদী চেতনার ঝোড়ো মেঘ। এই হেমচন্দ্রকেই মেদিনীপুরে গিয়ে গীতা আর তলোয়ার ছুঁইয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন অরবিন্দ বিপ্লবের মন্ত্রে, গুপ্ত সমিতির সদস্যরূপে।

বেশ তো, এসব বোঝা গেল। কিন্তু বোমার সঙ্গে মোচার ঘণ্টের সম্পর্কটা কি? সম্পর্ক? না, তেমন নিগূঢ় কোন সম্পর্ক নেই। তবে ফ্রান্স থেকে ফেরার পর দেখা গেল বোমা বানানোর চেয়ে কোর্মা কিংবা কাবাব বানানোর ব্যাপারে হেমচন্দ্রের আগ্রহ, দক্ষতা ও মনোযোগ অনেক প্রগাঢ়।

আলিপুরের জেলখানা। মাত্র কিছুদিন আগে মানিকতলার বোমার মামলায় ধৃত আসামীদের এনে পোরা হয়েছে গারদের ভিতরে। সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে তিনজন করে প্রাণী। সে একরকম দমবন্ধ অবস্থা। হঠাৎ একদিন কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলেন বন্দীদের অন্য জায়গায় সকলকে একসঙ্গে থাকবার। উপেন্দ্রনাথ সেই বন্দীদের একজন। তাঁর সরস স্বাক্ষ্য—

"ভাগ্য দেবতা সহসা প্রসন্ন হইয়া কেন উঠলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা তো হাসিয়াই খুন। আলিঙ্গন, জড়াজড়ি, লাফালাফি আর চীৎকার থামিতেই এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, যে তিনটি পাশাপাশি কুঠরীতে আমাদের রাখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাশের দুইটা কুঠরী ছোট। আর মাঝেরটা অপেক্ষাকৃত বড়। অরবিন্দবাবু ও দেবব্রতের মত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাঁহারা পাশের দুইটি কুঠরীতে আশ্রয় লইলেন। আর আমাদের মত 'চ্যাংড়া' যাহারা, তাহারা মাঝের বড় কুঠরীটি দখল করিয়া সর্বদিন ব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগোও আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন।....যাঁহাদের মাথার চুল পাকে, বুদ্ধিও পাকে কিন্তু বয়স বাড়ে না, হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। অসাধারণ

শক্তিমত্তার সহিত বালসুলভ তরলতা মিশিলে যে অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি হয়, হেমচন্দ্রের তাহাই ছিল। দুই-একদিনের মধ্যেই সর্ব-সম্মতিক্রমে তিনি সাধারণের 'হেমদা' হইয়া দাঁড়াইলেন।"

হেমচন্দ্রের এত জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে যেটা সবচেয়ে বড় কারণ, তা হলো তাঁর রাঁধুনীপনার যোগ্যতা। উপেন্দ্রনাথের বিবরণ—

"জেলের খাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ করায় ডাক্তার সাহেব আমাদের জন্য বাহির হইতে ফলমূল বা মিষ্টান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুশীল সেনের পিতা প্রায়ই আম, কাঁঠাল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতার অনুশীলন সমিতির ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস পাঠাইয়া দিত। সর্ববিদ্যাসিদ্ধ 'হেমদা' সেগুলি হাসপাতালে লইয়া গিয়া পোলাও বানাইয়া আমাদের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।"

সুতরাং মোচার ঘণ্টের ব্যাপারে হেমচন্দ্রের পরামর্শটা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাতে আর সন্দেহ কি? তবু মতবিরোধ। মত-বিরোধের মুল কাবণ হলো যে, আলোচ্য বিষয়টা মোচার ঘণ্ট। মোচার ঘণ্ট না হয়ে যদি কনফারেন্স বসতো কোর্মা, কাবাব, কালিয়া, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা নিয়ে তাহলে সকলেই, এমন কি একরোখা বারীন ঘোষও সেটা হয়তো মেনে নিতেন, মান্য করতেন। কিন্তু যেহেতু এটা একেবারে বাঙালী ঘরের খাদ্য, হেমচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে ঘোরতর সন্দেহ। তবু শেষ পর্যন্ত জয় হলো হেমচন্দ্রেরই। তারপর? শুরু হলো রন্ধন-পর্ব। শোনা যাক খোদ রাঁধুনীর মুখে।

"কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, তখন তাঁহার রন্ধন-বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্পর্কে আমার একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজর ফোড়ন কিরে বাবা? এ যে বেজায় ফরাসী কাণ্ড। কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল তখন আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া

চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ। খাইবার সময় হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল,—'হ্যাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de-cuisine বটে। দিদিমা আমার এমনটি রাঁধিতে পারিত না।' হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—'ঐ তো তোমাদের রোগ। তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী। দিদিমা যা করে গেছেন, তা আর বদলাতে চাও না।'

বারীন ঘোষ রাজনীতির বেলায় ঘোরতরভাবে বীররসের প্রচারক কিংবা সমর্থক। কিন্তু রবিবারের রাঁধুনি হয়েও রসনার বেলায় তিনি যে বীভৎস রসের সমঝদার হয়ে ওঠেন নি সেটা সত্যি। হেমচন্দ্রের মত রন্ধনশালাতেও বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে তাঁর উৎসাহ কোনদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কিনা ইতিহাসে তা নজিরহীন। তবে আন্দামানের রন্ধনশালা যে তাঁর আত্মকথায় উপেক্ষিত থাকে নি, তার প্রমাণ আছে। "প্রায় ছয় বৎসর পরে আমরা জেলের মধ্যে বাঁধিয়া খাইবার আদেশ পাইলাম। তিন হাত চওড়া ও পাঁচহাত লম্বা টিনের ঘর এই আমাদের রান্নাঘর। জেলের পাকশালা হইতে রাঁধা ভাত ডাল ও রুটি পাইতাম ও বাজার হইতে তরকারী ডিম মাছ কিনিয়া রাঁধিতাম। ক্রমশঃ নিত্যকার খাওয়াটা দাঁড়িয়েছিল মন্দ নয়। সরকারী দুধ চারজনে বার আউন্স করিয়া আটচল্লিশ আউন্স পাইতাম। তাহাতে সকালে ও দুপুরে চা চলিত। শেষ দুই বৎসর দুর্গোৎসব ও বড়দিনের দিন পোলাও লুচি মাংস যাহাই ইচ্ছা আয়োজন করার এক ভোজের ব্যবস্থা হইত। ধুঁয়ার ছলনা করিয়া হেমচন্দ্র ও উপেন নিত্য কাঁদিয়া পেঁয়াজ দিয়া মাছের ঝোল এবং পেঁয়াজের পাঁচফোড়ন দিয়া মোচার ঘণ্ট রাঁধিত। আমি রাঁধিতাম কেবল রবিবার। রান্নাঘরের আশেপাশে লঙ্কার চারা, পুদিনা ও লাউ কুমড়ার বাগান পর্যন্ত হইয়াছিল। রাঁধিবার সময় ছিল ১০টা হইতে ১২টা অবধি।

মোচার ঘণ্টের ইতিকথার এইখানেই ইতি। কিন্তু হেমচন্দ্রের রন্ধন-প্রতিভার ইতিহাস এইখানেই শেষ নয়। মোচার ঘণ্ট যেদিন

মোচার কাবাব রূপে আত্মপ্রকাশ করল হেমচন্দ্রের অসাধারণ পরামর্শে, তারই কিছুদিন পরের কথা। এবার এল সুক্তোর পালা। সকলেরই সুক্তো খাওয়ার সাধ। কথাটা কানে এল হেমচন্দ্রের। হেমচন্দ্র গলা বাড়িয়ে বললেন—এ, আর এমন কি কাজ। সবাই উৎকর্ণ। শোনা যাক উপদেশটা। হেমচন্দ্র বললেন—শোনো তাহলে। যে কোন একটা তরকারী রাঁধ। রাঁধা হলো তো, বেশ। এবার ঐ তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে নাও এক আউন্স কুইনানের মিকশ্চার। ব্যাস। সুক্তো সমাপ্ত।

হেমচন্দ্রের পরামর্শমত পোর্টব্লেয়ার জেলে সেদিন সুক্তো রান্না হয়েছিল কিনা তার প্রমাণ নেই। তবে সুক্তোরস-আস্বাদনে সেদিন যাঁদের রসনা সিক্ত হয়েছিল তাঁরা যে হেমচন্দ্র রচিত সুক্তোর চেয়ে হেমচন্দ্র কথিত সুক্তোর ফরমূলায় অনেক বেশী রসাস্বাদন করেছিলেন তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ উপেন্দ্রনাথের আত্মকথায় রয়ে গেছে।

"আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীশ গৃহিণী পাঁচখণ্ড পাক্-প্রণালী কোলে করিয়া রাঁধিতে বসেন, রাঁধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয়জয়কার পড়িবে।"

জয় হেমচন্দ্রের। অরবিন্দের হাতে তাঁর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের পরিণাম সার্থক। ফরাসী দেশ থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের হাতে কটা বোমা বানিয়ে বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদী হাওয়াকে কালবৈশাখী ঝড় করে তুলেছিলেন, সে ইতিহাস যদি ভুলেও যাই, দুঃখ নেই। মনে থাকবে ফরাসী প্রত্যাগত হেমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও সৃজনশীল প্রতিভা সহযোগে রন্ধন-প্রণালীর জগতে যে বিপুল সন্ত্রাসবাদ জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা তুলনাহীন। বোমা-রচয়িতা হেমচন্দ্রের চেয়ে মোচার-কাবাব রচয়িতা হেমচন্দ্র কি কোন অংশে কম বিপ্লবী?

প্ল্যানচেট ও স্বাধীনতার আন্দোলন

তখনো তিনি 'দেশবন্ধু' হয়নি। তখনো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি তাঁর ত্যাগ ও তেজস্বিতার তীব্র জ্যোতি। যে মহতো-মহীয়ান নেতার অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব তাঁর মূর্তিতে রক্তাক্ষরে লেখা, দেশের মানুষের কাছে তা তখনো অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। তখন তিনি শুধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অথবা দাশ মশাই। কিংবা মিঃ দাশ। একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার, এই তাঁর পরিচয়।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস করতেন অলৌকিকে। জীবনের সবটাই অঙ্কের হিসেব নয়। কিছু আছে হিসেব-নিকেশের বাইরে, বুদ্ধি-বিবেচনার অগোচরলোকে, চেতন-অবচেতনার অতল রহস্যের অন্তরালে।

বাড়ির কাছেই বকুলতলার মোড়। দিনে রাতে সেখানে দুর্ঘটনা

লেগেই আছে। বিশেষ করেই মোটর-দুর্ঘটনাটাই বেশি। এই ক্রমাগত দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে শুনে চিত্তরঞ্জনের মনে একটা দৃঢ়মূলে ধারণা জন্মেছিল যে, ঐ বকুলতলার আশপাশে নিশ্চয়ই ঘোরাফেরা করে কারও অতৃপ্ত আত্মা।

আলিপুরে শুরু হয়েছে বোমার মামলা। মানিকতলার বাগানে ধরা পড়েছে বোমা বানানোর দল, বামাল সমেত। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন ব্যানার্জিরা রয়েছে বন্দীদের দলে। অরবিন্দের সঙ্গে মানিকতলায় আবিষ্কার বোমার কারখানার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইংরেজের চোখে অরবিন্দ অনেকদিন থেকেই ব্রিটিশ রাজত্বের 'পয়লা নম্বরের শত্রু'। সুতরাং ছলে বলে-কৌশলে তাঁকেও জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ইংরেজের ধারণায় তিনিই নাটের গুরু। ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্রদাতা পুরোহিত। তিনিই রাজদ্রোহীদের রাজা। অতএব রাজরোষ উদ্যত।

বোমার মামলার প্রথম দফা প্রহসন অথবা প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বারলি সাহেব মামলাটিকে তুলে দিলেন দায়রা কোর্টে। অরবিন্দকে বাঁচাতে হবে। বোন সরোজিনী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন অর্থ সাহায্যের জন্য। টাকা উঠল কয়েক সহস্র, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দানে। কিন্তু মামলা চালানোর পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। আসামীপক্ষের কৌঁসুলির দায়িত্ব দিতে হবে একজন নাম-করা বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক ব্যারিস্টারকে। তাঁর দক্ষিণা দেবার মত টাকা কই? 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মামলায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে বাঁচানোর জন্য চিত্তরঞ্জন চোখ থেকে মুছে ফেলেছিলেন ঘুম, মুখ থেকে আহার্য, দেহ থেকে ক্লান্তি, মন থেকে পরাজয়ের আশঙ্কা। চিত্তরঞ্জনকে যদি এ মামলায় পাওয়া যেত, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত চোখ বুজিয়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়োগ করার টাকা জোগাবে কে?

বোন সরোজিনী, মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ-জনেরা যখন অরবিন্দ-মামলার অনিশ্চয় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিশেহারা, সেই সময়ই নিজের ঘরে নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির তাগিদেই চিত্তরঞ্জন বসেছেন প্ল্যানচেটে। অবসর সময়ে আমোদ উপভোগের এটা ছিল তাঁর একটা অন্যতম উপকরণ। নিশ্চয় সবটাই বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ নয়, কিছুটা বিশ্বাসও সম্ভবত ছিল মিলেমিশে। তাঁর জীবনীকার লিখছেন—

"সে সময়ে আমোদস্বরূপ প্রায়ই টেবিলে বসিয়া স্পিরিট আনিতেন। একদিন কেবল একটি কথাই বারম্বার আসিতেছিল—'ইউ মাস্ট ডিফেণ্ড অরবিন্দ।' 'অরবিন্দের পক্ষ নিশ্চয়ই আপনাকে সমর্থন করিতে হইবে।'

তিনি প্রশ্ন করিলেন—'আপনি কে?'

উত্তর আসিল—'উপাধ্যায়'।

'ভাল বুঝিলাম না।'

আবার উত্তর আসিল—'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।'

ইহার পরে তিনি বুঝিলেন, অরবিন্দের মোকদ্দমা নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে আসিবে। এবং কথা প্রসঙ্গে কোন কোন বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন, আমি এখানে বসে আছি, ইহা যেমন সত্য, এ মোকদ্দমা আমার হস্তে আসবে ইহাও তদ্রূপ সুনিশ্চিত।"

তাই-ই হল। কৃষ্ণকুমার মিত্র আর্থিক সংকটের সংকোচ নিয়েও যেদিন এসে প্রস্তাব করলেন, তখনই তা গৃহীত। শিরোধার্য হল প্ল্যানচেটে পাওয়া ব্রহ্মবান্ধবের আন্তরিক অনুরোধ। মামলা হাতে নিয়ে অসাধ্যসাধন করলেন চিত্তরঞ্জন। ইংরেজ পক্ষের সাজানো সুকৌশল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল চিত্তরঞ্জনের অভ্রান্ত যুক্তির উপস্থাপনায়, অপ্রতিরোধ্য উদ্যমে। মুক্তিলাভের পর মুক্তকণ্ঠে অরবিন্দ দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের তপস্যা-সুলভ কর্মকাণ্ডের প্রতি অকৃপণ ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অরবিন্দের মুক্তিতে চিত্তরঞ্জন ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন কাকে? নিশ্চয়ই উপাধ্যায়কে। কারণ, তিনিই প্রথম প্রস্তাবক, প্রথম প্রেরণাদাতা।

প্ল্যানচেটের প্রভাব শুধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেই নয়, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে যে আসামীকে তিনি রক্ষা করলেন, রক্ষা করে দেশের অফুরন্ত আশীর্বাদ কুড়োলেন, সেই অরবিন্দের জীবনেও ছিল অবিমিশ্র। প্ল্যানচেট খেলায় অরবিন্দের সুযোগ্য সঙ্গী তাঁর আপন ভাই বারীন ঘোষ তাঁর আপন আত্মকথায় বুনেছেন সেই সব মুহূর্তের ছবি, যা স্বাদে অলৌকিক, সংবাদে কৌতুকময়। অরবিন্দ তখন বরোদায়, বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল, সেই সময়ের কথা।

"বরোদায় আমি বোধ হয় তিনবার গিয়েছিলুম। প্রথমবার যখন যাই, তখন সেখানে দিদি ও সেজবৌদি ছিলেন না বলেই মনে হয়। তখন এবং আবার যখন দিদি বৌদি ও সেজমামীকে নিয়ে দেওঘর থেকে পূজোর ছুটির পর বরোদায় (সেজদার সঙ্গে) আমি ফিরি তখনও আমাদের অবসর-বিনোদন হতো প্লানচেট নিয়ে। প্ল্যানচেট হচ্ছে দুটো বোতামের মত পায়ার উপরে তেকোণা কিংবা পানের আকৃতির একটা কাঠ, তার এক দিকের ছিদ্রে একটা পেনসিল লাগানো থাকে। কাঠটার ওপর দুজনে হাত রাখলে ওটা ক্রমশ চলে এবং পেনসিল দিয়ে লিখতে থাকে। যে শক্তি এসে হাতে ও প্লাঞ্চেটে ভর করে লেখে, সে কখন বলে "আমি রামমোহন রায়," কখনও বলে "আমি নিত্যানন্দ সরকারের পিসী দত্তদের শালকের বাড়ির বেলগাছে আছি" ইত্যাদি। টেবিল বা প্লাঞ্চেটে হাত রাখলে হাত যে আপনি চলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি কিন্তু সে শক্তি যে কি—আমাদেরই অবচেতনার খেলা বা কোন পারলৌকিক জীবাত্মা বা ভূতের কার-সাজি তা বলা শক্ত। আমি এই স্পিরিচুয়ালিস্টদের বেদ মায়ার্সে'র প্রচণ্ড বই দু'খানা Human personality পড়ে ফেলেছিলুম, স্যার কোনান ডয়েল ইত্যাদির কথাও ঢের দেখেছি, কিন্তু কাউকে ঠিক ঠিক

প্রমাণ করতে দেখিনি যে এই সব খেলা সত্যিই পারলৌকিক জীবের খেলা। প্রাঞ্চেটে কিছু একটা শক্তি এসে মৃত কোন আত্মীয়ের নামে হুবহু পূর্ব ঘটনা বলছে, এতে প্রমাণ হয় না যে ভূত বা প্রেতাত্মায় বলছে; আমাদের অবচেতনা বা ঊর্ধ্বচেতনায় এমন সব অলৌকিক শক্তি বা বৃত্তি আছে যার প্রকাশে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। টেলিপ্যাথি ও টেলিভিশন যখন আজ প্রায় সর্ববাদিসম্মত ব্যাপার তখন ঐ ধরনের আরও কত-না বিচিত্র কাণ্ড থাকতে পারে এই অখণ্ড চৈতন্যময় জগতের গোপন স্তরে স্তরে।”

বারীন ঘোষ আপাদমস্তক বিপ্লবী। এদিকে বুদ্ধিটা বিজ্ঞানীর। তাই প্ল্যানচেটী-খেলায় আমোদ যত, অবিশ্বাসও তার চেয়ে কম নয়। অবশ্য যে সময়ের কাহিনী, তখনও বিপ্লবী অথবা বোমাড়ে বারীন ঘোষের জন্ম হয়নি। তখন তিনি পরিপূর্ণ বেকার। বারোদায় এসে অরবিন্দের আশ্রয়ে আছেন ছন্নছাড়া জীবনের দিনগুলোকে অলস বিশ্রামের অফুরন্ত সুখে ভরিয়ে নিতে। কাজের মধ্যে গভীর বনে শিকার, কবিতা আর উপন্যাস লেখা, বাগানে ফুল ফোটানো, বিকেলে পার্কে রূপসী পারশি রমণীদের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকা আর কখনো কখনো একটা ভাঙা এস্রাজ নিয়ে সুর-সাধনা। কিন্তু অবসর এত বিপুল যে, এতেও সময়ের সব ফাঁকটুকু ভরে না। তখনই প্ল্যানচেটে বসা, দুই ভায়ে।

“শ্রীঅরবিন্দের ‘Yoga and its objects’ বইখানা তাঁর নিজের লেখা নয়, তিনি পেন্সিল ধরতেন আর এক অদৃশ্য শক্তি এসে লিখে যেত; রামমোহন রায়ের নামে এইভাবে আগাগোড়া বইখানি পাওয়া গিয়েছিল; যখন এই ঘটনা ঘটে তখন অবশ্য আমি আন্দামানে। বরোদায় আমরা যতজন বসতুম তার মধ্যে সেজদা ও আমার হাতেই এইভাবে লেখা আসতো বেশী। একদিন স্বয়ং তিলক এসে নানা প্রশ্ন করে যান, তখন আমার হাতে পেন্সিল ছিল।........প্রতিদিন আমরা কি যেন একটা নেশা ও ঝোঁকের মাথায় দু'তিন ঘণ্টা ধরে

এই কার্য করতুম। এবং সেই দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে কত রামকৃষ্ণ, ফাদার দামিয়ন, কৃষ্ণদাস পাল, কত ভূতযোনিপ্রাপ্তা পিসী মাসী ঠাকুর্দা বন্ধুবান্ধব এসে দেড় টাকার প্লাঞ্চেটের প্রসাদং আমাদের সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়ন করে প্রাণ জুড়িয়ে যেতেন তার তো হিসাব-হদিশ ছিল না।"

এইভাবে দিন কাটছিল হঠাৎ একদিন প্লাঞ্চেটেই সব দিলে ওলট-পালট করে। "যাই হোক, এই প্লাঞ্চেটী ব্যাপারে ক্রমশ আমাদের জীবনের নদীপথে তরীখানি বাঁক নিয়ে আবার অন্যপথে চলবার আয়োজন করে নিল। রামমোহন কি বিবেকানন্দ বা অমনি কেউ এসে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল দেশে নব আনন্দমঠে সন্তান-সেনা গড়বার জন্যে। তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে গুজরাটের গুপ্তচক্রের দেশপতি (প্রেসিডেন্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা-সেনা বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো বাংলাদেশের তরুণদের ও ছাত্রসমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার জন্যে; 'যতীনদা' কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেননি। আমাকে বাংলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতি দিয়ে যেমন করে হাতি ধরে গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল।"

১৯০২। বরোদা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন সৈনিক যতীন্দ্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকে বিশাল স্বপ্ন, স্বাধীনতার। হাতে একটি চিঠি অরবিন্দের। সরলা দেবীর নামে লেখা। সরলা দেবীর ব্যায়াম সমিতিই আজ কলকাতায় স্বদেশী শিক্ষার একমাত্র আস্তানা। বীরাষ্টমী ব্রত, শিবাজী উৎসব, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এই সব

দিয়ে কলকাতার মরা নদীতে প্রাণের জোয়ার জাগানোর কাজে সরলা দেবী সমর্পিত-প্রাণ। যতীন্দ্রনাথকে তিনি সাহায্য করলেন গুপ্ত সমিতি গড়ার গোড়ার ব্যাপারে। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারলেন না। কিছু টাকাকড়িই সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল। সংগঠন এগোয়নি। ঠিক তখনই গুজরাটের গুপ্ত সমিতির অস্থায়ী দেশপতি অর্থাৎ অরবিন্দের নির্দেশে বারীন ঘোষ বরোদার ভোগবিলাসে ভরা অলস মন্থর জীবনের মায়া কাটিয়ে চলে এলেন কলকাতায়, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে।

১৯০৩। কলকাতায় গুপ্ত সমিতি গড়ার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মূল কারণ নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। যতীন্দ্রনাথ বনাম বারীন ঘোষের মন কষাকষি। অরবিন্দ বরোদা থেকে ছুটে এলেন, ভাঙা সংগঠনে জোড়া লাগাতে। পারলেন না। গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেল। যতীন্দ্রনাথ রাগে দুঃখে চলে গেলেন পাহাড়-পর্বতের দিকে, সন্ন্যাস নিয়ে। নাম হল নিরালম্ব স্বামী। বারীন ঘোষ আবার ফিরে গেলেন বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে।

কিন্তু ইতিহাসের এইখানেই শেষ নয়। যে বারীন ঘোষ বোমাড়ে এবং বিপ্লবী হবার জন্য জন্মেছেন, বরোদায় ফিরে, বরোদায় শান্ত-সুন্দর নির্বিঘ্ন জীবনের আরাম-আনন্দের মধ্যে গা ডুবিয়ে দিন কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কি করে? ললাটের রক্ততিলক যে তাঁর ললাট-লিপি।

"কিছুদিন বাঙলা দেশে ব্যর্থ বিপ্লব প্রচেষ্টা করবার পর যতীনদার সঙ্গে গৃহবিবাদে আমাদের কেন্দ্রটি ভেঙে যাওয়ায় আবার সেই বরোদায় আমি সেজদার সঙ্গে ফিরে যাই। সেখানে আবার কিছুকালের জন্যে আরম্ভ হলো সেই শান্ত সুখ, নিরালা জীবন, সেই শিকার, কবিতা-চর্চা ও সঙ্গীবাগ। তখন আমি বোধহয় 'মিলনের পথে' লিখছি। আবার, আমাদের প্লাঞ্চেট নিয়ে ভূতের রিসার্চ আরম্ভ হলো। এবার কে একজন অনৈসর্গিক জীব রামমোহন না

নন্দ অমনি একজনের নামে এসে আমাদের ক্রমাগত উত্তেজিত তে লাগলো দুর্গম বনে পর্বতে 'ভবানী মন্দির' গড়বার জন্যে। এই মন্দিরে দীক্ষাপ্রাপ্ত সমর্পিতপ্রাণ কর্মীরা সব বাঙলা দেশে গড়বে অনুপম এক মুক্তির পীঠস্থান।"

এর পরের ইতিহাস আমাদের জানা। ১৯০৫-এ অরবিন্দ লিখলেন 'ভবানী মন্দির' নামক ১৫-১৬ পাতার পুস্তিকা। সেই পুস্তিকাই হয়ে উঠল সেকালের গুপ্ত সমিতির বেদমন্ত্র। বরোদা থেকে বারীন্দ্র এলেন কলকাতায়, ডি, গুপ্তের প্রেসে 'ভবানী মন্দির' ছাপাতে। তারপর বারীন ঘোষের নিজস্ব উদ্যমে বেরুল 'অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু' সম 'যুগান্তর' পত্রিকা। যুগান্তর পত্রিকার আপিসে জমে উঠল যুগান্তরের আড্ডা। যুগান্তরের আড্ডা থেকে বাংলা দেশের ভূমিপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হল বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বাঙালীর বিপ্লব প্রচেষ্টা, বিপ্লবী বাঙালী। বরোদার বিলাসী বারীন ঘোষ বিপ্লবের রক্ত-রাঙা উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ করে বাংলা দেশে উদ্বোধন করলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন এক রক্তাক্ত অধ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধ ও মোহনবাগান

প্রণাম শেষ করে উঠে দাঁড়াল জনদশেক জোয়ান ছেলে। দলের নেতা চোরবাগানের বসু পরিবারের ছেলে শৈলেন বসু বললে—

"মা চল্লুম, ছমাস পরে আবার আসব।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"কাল আবার মাঠে খেলা আছে। এবার আর ফিরিঙ্গীদের প্রহার-ভয়ে আমরা পলাতক হব না। উত্তম-মধ্যম না দিয়ে ছাড়ব না। তার দরুন যদি জেলে যেতে হয় যাব। আইনেতে ছ' মাসের বেশী সে ধারায় সাজা নেই। তাই বলছি ছ' মাস পরে আপনার শ্রীচরণে আবার আসব।"

তারা চলে গেল। যাবার আগে তারা নিশ্চয় প্রাণভরা আন্তরিক আশীর্বাদ পেয়েছিল সরলা দেবীর। তারা সরলা দেবীরই ব্যায়াম সমিতির সভ্য। সরলা দেবীই তাদের মরচে পড়া বুকের ছাতিতে ভরে দিয়েছেন দুরন্ত দুঃসাহসী যৌবন। সরলা দেবীই, যিনি বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় উৎসবের উদ্বোধিকা ও অনুষ্ঠাত্রী, সেদিনের শীর্ণকায় বাঙালী যুবকের কানে কানে একটি মন্ত্রই শুনিয়েছেন বার বার—"বীরোভব"। যখন সে মন্ত্রে কাজ হয়নি তখন শুনিয়েছেন মাতৃ-কণ্ঠের ধিক্কার। মুখে এবং ভারতীর পাতায় —কলমেও।

আপন আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন—

"কলকাতায় মোহনবাগান তখনো ময়দানে নামেনি। সেকালে মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই খেলা চলত এবং অনেক সময় দু দলে রক্তারক্তি খুনোখুনিও হত শোনা যায়। হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রতিবারই পরাস্ত প্রতিপন্ন হত। এবারে আমার ক্লাবের ছেলেদের কাছে গল্প শুনলুম আগের দিন মাঠেতে হিন্দু ছেলেরাই খেলায় জিতেছিল Umpire-এর অপক্ষপাত নির্ধারণও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার পরে ফিরিঙ্গি ছেলেরা আক্রোশে দল বেঁধে একপাল উন্মত্ত ষাঁড়ের মত যেমন তাদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে "যঃ পলায়তি স জীবতি"—এই নীতির অনুসরণে। একটা হিন্দু ছেলেও তাদের সম্মুখীন হল না। আমি বর্ণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলুম— তোমরা কজন ছিলে? কি করলে?" তারা বললে—"আমরা দশ বারোজন ছিলুম। আমরা কি করতে পারি? আমরাও সরে পড়লুম।"

আমি তাদের ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। বললুম—বৃথা তোমাদের অস্ত্র-বিদ্যা শেখা, বৃথা তোমাদের এখানে লাঠি ঘোরান। কাল থেকে আর এসো না।"

এই হল মুখের ভর্ৎসনা। এরপর আছে ক্ষুরধার কলমের ক্ষমাহীন শাসন।

"শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ রাজা সাম্বর সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হলে তাঁর সারথি যখন তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ক হয়, তিনি সংজ্ঞালাভ করে জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—'একি করলে? আমার নাম চিরকালের জন্যে বীরসমাজ থেকে মুছে দিলে? যদুকুলবৃদ্ধেরা কি বলবেন? আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি শুনে আমার পিতা পিতৃব্যেরা কি মনে করবেন? যদুললনারা কি আমায় কাপুরুষ কুলকলঙ্ক বলে ঘৃণা করবেন না? ফিরাও, ফিরাও রথ—আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল, ফের সারথি।'.. তোমরা সেই ভারতের সন্তান। যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারত বালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ো না।"

সেই ভীষণ ভর্ৎসনার পরিণামেই বহু বছর পরে সরলা দেবীর নিজের ব্যায়াম সমিতির জনদশেক ছেলে মরণ-পণ সাহস বুকে নিয়ে সেদিন দেখা করতে এসেছিল তাঁর সঙ্গে। তারা যাবে খেলার মাঠে। তারই জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি। যেহেতু তখনো খেলা মানে খেলা নয়। খেলা মানে একটা শাসক জাতির সদম্ভ উৎপীড়ন, গোরাদের নির্যাতন, মিলিটারীর হাতে লাঞ্ছনা।

এই রকম মারের খেলার একটি চমৎকার বর্ণনা ফুটে রয়েছে বিপ্লবী যাদুগোপালের জীবনস্মৃতিতে—

"১৯০৩ সাল। মোহনবাগান ও মেডিক্যাল-মিলিটারী 'ট্রেডস-কাপে' সেমি-ফাইনালে পড়ে। মেডিক্যাল-মিলিটারী খেলত যত, তার চাইতে মারত বেশী। তাদের সমর্থক টুপিধারীরা ঘুষি, লাথি, ভারতীয় দর্শকদের উপর চালাত। মোহনবাগান তখনো শীল্ডে খেলার মত আত্মবিশ্বাস লাভ করেনি। সবাই জানত শীল্ডে যাওয়া তাদের পক্ষে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া'। দেশী টিমের

মধ্যে শোভাবাজার শীল্ডে খেলত।....১৯০২ সালের আগে কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম ছিল। শুধু খিদিরপুরের ট্রাম চলত ছোট একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে। ১৯০২-৩ সালে ইলেট্রিকের ট্রামের ব্যবস্থা হয়। নতুন লাইন হচ্ছিল বলে আর্মেনিয়ান গ্রাউণ্ডের কাছে বহু খোয়া জমা ছিল। এই মাঠে মোহনবাগানের ম্যাচ। স্কুলে স্কুলে নোটিশ বোর্ডে দেখা গেল—"আজ মোহনবাগানকে মিলিটারীরা মারবে বলে ঠিক করে রেখেছে। ভাই সব, চল সেখানে। অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে।"

খেলার পূর্বে দেখা গেল—"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব।" উভয় পক্ষের লোক ভিড় করে জমা হয়েছে। শিবদাস ভাদুড়ী গোলের কাছে দু'একবার বল নিয়ে দৌড়ে যাবার পর মিলিটারীর এক খেলোয়াড় তাকে পায়ে মেরে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চজন্য, তুরী, ভেরী-নিনাদ শুরু হল। তুমুল সংগ্রাম। একজন শ্বেতাঙ্গ-অশ্বারোহী পুলিশের লোক কালা আদমীর দিকে ধাওয়া করতে আমার সেজদা ক্ষীরোদগোপাল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিল। মুখে বলল, যাও অন্যদিকে নিরাপত্তা খুঁজতে। ট্রামের জমা-করা খোয়াবৃষ্টিতে মিলিটারীরা সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়েছিল। এই যুগে এই প্রথম ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিল।"

প্রতিদিনই জমা হচ্ছিল বুকের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই। কলকাতায় সেদিন আর আগুন নয়। আগ্নেয়গিরি। এখুনি ফেটে পড়বে জ্বলন্ত উদ্গীরণে—এই রকম তার হাব-ভাব। খেলার মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। C.F.C. মাঠে সমবেত হয়েছে এক লাখ লোক। খেলার মাঠে এর আগে এত মানুষ কলকাতা কখনো দেখেনি। দর্শক এসেছে ভারতবর্ষ ঝেঁটিয়ে। এসেছে আসাম থেকে, উড়িষ্যা থেকে। খেলা রবিবারে। কিন্তু শনিবার বিকেল থেকেই

হাজার দশেক লোক মাঠে জমা হয়ে গেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দিয়েছে স্পেশাল ট্রেন। হাওড়া থেকে বর্ধমান। বর্ধমান থেকে হাওড়া। চলছে স্পেশাল স্টীমার সার্ভিস। রাজগঞ্জ আর বরানগর থেকে। স্পেশাল ট্রাম গাড়ী আসছে ময়দানে মানুষ বোঝাই করে চীৎপুর, শ্যামবাজার থেকে। হাইকোর্ট থেকে পুরো স্ট্র্যাণ্ড রোড শুধু গাড়ী, গাড়ী আর গাড়ী। 'এম্পায়ার' পত্রিকা C.F.C. গ্রাউণ্ডের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনের যোগাযোগ করে নিয়েছে। যাতে খেলার ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যায়।

রবিবার। শহর ভরা ছুটি। শহরের আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। তার নীচে জ্বলন্ত উদ্বেগে অপেক্ষমান লক্ষাধিক দর্শক। রয়টারের হিসেব অবশ্য ৮০ হাজারের বেশী নয়। বাজনা বাজছে সুগম্ভীর শব্দে। বাজাচ্ছে রাইফেল ব্রিগেড। এখন দর্শকদের চোখ মাঠের দিকে নয়। হাতের ঘড়ির দিকে। আর মাত্র ১ মিনিট বাকী সাড়ে পাঁচটা বাজতে। এই তো, এই তো বাজল। এই তো এগিয়ে এল প্রত্যাশিত শুভক্ষণ। ঐ তো মাঠে নামছেন মিঃ এইচ জি পুলার, অর্থাৎ রেফারী সাহেব। তারপর আকাশে যেন এক লক্ষ বজ্র বেজে উঠল, সেই মাঠে নামলেন মোহনবাগানের দলনেতা শিবদাস ভাদুড়ী। এইবার তবে শুরু হল মরণ-বাঁচন খেলা।

অধিনায়কের পিছনে একে একে একাদশ খেলোয়াড়।

হীরালাল মুখার্জী। পঁচিশ। গোলকীপার। মার্টিন এ্যাণ্ড বার্ণের ব্রিক-ফিল্ডের কেরানী।

এ. সুকুল। বাইশ। রাইট ব্যাক। আর—

বিজয়দাস ভাদুড়ী। তিরিশ; এঁরা দুজনে এক ব্যবসার পার্টনার।

সুধীরকুমার চ্যাটার্জী। সাতাশ। লেফ্‌ট ব্যাক। ভবানীপুর L. M. S. কলেজের অধ্যাপক।

মনোমোহন মুখার্জী। আঠাশ। রাইট হাফ্। P. W. D-র চাকুরে।

নীলমাধব ভট্টাচার্য। পঁচিশ। লেফ্‌ট হাফ। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কেরানী।

শ্রীশচন্দ্র সরকার। পঁচিশ। ইনসাইড রাইট। কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের কেরানী।

শিবদাস ভাদুড়ী। সাতাশ। ভেটেরিনারী ইনস্‌পেক্টর।

আর যতীন্দ্রনাথ রায়, রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও অবিনাশ ঘোষ কলেজের ছাত্র।

টসে জিতেছিল ইয়র্কশায়ার। কিন্তু দিনের শেষে খেলায় জিতল মোহনবাগান। মোহনবাগান হাতে তুলে নিল শীল্ড। মোহনবাগানের হাত থেকে বাংলা দেশ বুকে তুলে নিল একটি সার্থক স্বপ্ন। সে-এক আলোড়িত জয়। সে এক ভীষণ আন্দোলিত জয়োল্লাস। বিজয়ী দলকে তোলা হল ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে। সেই গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ছিদ্রহীন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে। গাড়ী থামবে মিঃ এস এন বোসের বাড়িতে। তিনি ক্লাবের সেক্রেটারী, ক্লাবের আত্মা। তাঁর বাড়ীতে দলে দলে লোক আসছে বিজয়-চিহ্ন শীল্ডটিকে দেখতে। কারো কারো দেখেও আশ মেটে না মনের। হাত দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সেদিন সে যেন এক জাতীয় উৎসব। যেন বাঙালী জাতটা কোথা থেকে ফিরছে দিগ্বিজয় করে। ঘরে ঘরে উৎসব। পথে পথে উৎসব। নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, গর্বে গৌরবে কলকাতা জুড়ে প্রাণের সে এক মহাকল্লোল। ‘আদি ব্রাহ্মসারস্বত নাট্য সমাজ’ আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না এত বড় একটা দারুণ জয়ের দিনে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করলে একটা গানের পালা। সেই পালা সেই রাত্রে সহস্র দর্শকের সামনে গেয়ে শোনানো হল ক্লাব সেক্রেটারীর বাড়িতে।

রাত পোহাল। পরের দিন থেকে শুরু হল কাগজে কাগজে অক্ষরে অক্ষরে, ছত্রে ছত্রে বিজয়ী দলের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি। স্টেটস্‌ম্যানে, এম্পায়ারে, ডেলি মেলে, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে, ইংলিশম্যানে, ক্যাপিটালে, পাতা ভর্তি খবর, সম্পাদকীয়। প্রত্যেকের পাতাতেই ধন্য ধন্য রব।

'স্টেটসম্যান' তার সম্পাদকীয়তে লিখলে—

ইয়র্কশায়ার দল খাঁটি খেলোয়াড়ী মনোভাব থেকে নিশ্চয় স্বীকার করে নেবে যে, মোহনবাগানের এই জয় হঠাৎ কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। নিশ্চয় তারা অনুভব করবে যে শিবদাস ভাদুড়ীর মধ্য দিয়ে তারা এমন একজন ফরোয়ার্ডকে দেখেছে, তার তুল্য খেলোয়াড় তাদের নিজেদের দলেও দুর্লভ। আসলে ক্যাপটেনের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাই মোহনবাগানের জয়ের মূল কারণ। আমরা অনায়াসে আশা করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতেই এই দলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে ইংলণ্ড-সফরে।

'টাইমস অব্‌ ইণ্ডিয়া' মোহনবাগান দলকে তখুনি আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল বোম্বাই-সফরে।

'ইংলিশম্যান' লিখলে—মোহন কথার যা অর্থ মোহনবাগান তাইই ঘটিয়েছে। এর জন্যে শুধু বাংলা দেশ নয়, ভারতবর্ষও গর্বিত।

'মডার্ণ রিভিউ'-এর কণ্ঠস্বর ভিন্ন। তাতে আন্তরিকতা আছে। কিন্তু আপাতঃ আবেগের বিহ্বলতা নেই।

"একটা ফুটবল ম্যাচের সাফল্য বা জয়কে নিয়ে এত উদ্‌ভ্রান্ত হব কেন আমরা? আমরা কি জানি না যে আমরা আরও বহু বৃহত্তর কাজেও সক্ষম। যে কাজ শুধু পৌরুষ দেখিয়ে পাবার নয়, যার সঙ্গে সমবেত ঐক্য আর সুচিন্তিত নেতৃত্ব দুইই অঙ্গাঙ্গী জড়ানো।"

অমৃতবাজারে বেরুল বিরাট সম্পাদকীয়। নাম 'অমর একাদশ'।

"ঈশ্বর আমাদের মোহনবাগানের একদশ খেলোয়াড়কে আশীর্বাদ করুণ। বিদেশী খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়াকৌশলকে পর্যুদস্ত করে

রবিবারের খেলায় তাঁরা নিজেদের যে নৈপুন্য প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা সম্মানিত করেছেন একটা গোটা জাতিকে। এই জয় আমাদের। এই জয় দৈহিক শক্তির বাঙালী ভীরু, বাঙালী শক্তি-হীন বলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে বিলাপ করেছি, এই ঘটনায় তা দূর হল। এই ঘটনা আমাদের মনে ফিরিয়ে আনুক আত্মবিশ্বাস। উৎসাহ জোগাক আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে।

'বেঙ্গলী'তে শুধু দুর্দান্ত সম্পাদকীয় নয়, সেই সঙ্গে ছেপে বেরুল কবিতা—

"থ্যাঙ্কস মাই ফ্রেণ্ডস্ অফ ফুটবল রিনাউন
ফর ব্রিংগিং দা ব্রিটিশ টিম ডাউন।
এ ভিক্টরী গ্রাউণ্ড টু বিহোল্ড
সিরিন এণ্ড নোবল, ব্রাইট এণ্ড বোল্ড।"

কবিতা লিখলেন আরো অনেকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সেকালের একজন স্মরণীয় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাপা হল মানসীতে। ছাপা হল মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড়ের প্রতিকৃতি। বিক্রী হতে লাগল হাজারে হাজারে। ব্যবসায়ীরাও চুপ করে নেই। এই ফাঁকে নিজেদের পণ্যের প্রচারে কাজে লাগালে অমর এগারোজনের ছবিকে। স্টার থিয়েটার তার বিজ্ঞাপনে লিখলে যে, খেলার মাঠে মোহনবাগান জয় করেছে শীল্ড। স্টার থিয়েটারে 'বাজীরাও' জয় করেছে দর্শক।

স্ট্যাণ্ডার্ড সাইকেল কোম্পানী এগারো জন খেলোয়াড়ের হাফটোন ছবি ছেপে অমৃতবাজার পত্রিকার সংগে জুড়ে দিলে জনসাধারণের বিতরণের জন্যে। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের দোকান বিনা মূল্যে ঐ ছবি বিলি করা হল এক লক্ষের মত। মেসার্স হাল্ড এণ্ড চ্যাট অর্থাৎ হালদার এ্যাণ্ড চ্যাটার্জী কোম্পানী দুমাসের জন্যে বিশেষ 'সুবর্ণ সুযোগ' ঘোষণা করলে এই উপলক্ষে। তাঁদের নিজেদের

ফ্যাক্টরীতে তৈরী হারমনিয়ম এই দুমাস দশ পার্সেণ্ট ডিসকাউণ্টে বিক্রি করা হবে।

নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ। উপহার উপহার উপহার। শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা। এর আর গোনা-গুনতি নেই। আসছে তো আসছেই। শহরে খবর ছড়াল যে দেশীয় রাজা-মহারাজারা খেলোয়াড়দের উৎসাহিত উদ্বোধিত করার জন্যে প্রচুর নগদ টাকা উপঢৌকন দিতে চায়। মোহনবাগান তা শুনে এক বিবৃত্তিতে জানালো যে-এজাতীয় উপঢৌকন নিতে তারা সম্মত নয়। যদিও এই পুরস্কার বিজয়ী খেলোয়াড়দের প্রাপ্য, তাঁরা পাওয়ার যোগ্য, তবু এই ক্লাব সমবেত প্রচেষ্টায় তৈরী। কি হিন্দু, কি মুসলমান কি ইউরোপীয়ান এদের প্রত্যেকের সাহায্যেও সহযোগিতায় ক্লাবের উন্নতি। এ খেলার জয় কোন বিশেষ কারণে নয়। মূল কারণ হল নিয়মিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন।

খেলার দিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এর গায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেশের ছায়া পড়েনি কোথাও। মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের এই জয়ে উন্মত্ত আনন্দে দিশেহারা হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে—এ খবর কোন লোক মুখে শোনা কথা নয়। ছাপার অক্ষরে কোটা। এবং তা ছাপা হয়েছিল "THE MUSSALMAN" পত্রিকাতেই।

সমস্ত কলকাতা জুড়ে সেদিন যেন আনন্দের, উল্লাসের, উচ্ছ্বাসের, উৎসাহের একটা ভূমিকম্প। লোকে বলতে শুরু করলে, "ইঁটের পাঁজা হে, ইঁটের পাঁজা। একখানা ইট সরাতে পারলেই বাকীগুলো সব নড়ে যাবে। ইংরেজের যেটা আসল জোর, সেটা হল আমাদের ভীরুতা, দুর্বলতা। আমরা জাগলে ওরা এমনি করেই হারবে।"

১৯১১ সাল। বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে পড়ে কার্জনের হাতে দু'টুকরো হওয়া বাঙলা দেশকে আবার জোড়া লাগাতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা।

সেও এক তুমুল জয়। তার সঙ্গে এসে মিলল মোহনবাগানের জয়োল্লাস। বাঙলা দেশের মনের অবস্থাটা যেন এইরকম, এতদিনে নেওয়া হল পলাশীর প্রতিশোধ। পলাশীর মাঠে যে ইংরেজ মোহনলালকে মেরে ভারতবর্ষকে বগলদাবা করেছিল আজ মোহনবাগান সেই ইংরেজকে মেরেছে খেলার মাঠে।

তাঁর জীবন-স্মৃতিতে যাদুগোপাল সেকালের কলকাতার এই মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন নিজের ভাষায়।

"১৯১১ সালের রাজনৈতিক জয় পরাধীন জাতির আশাকে কতকটা বাড়িয়েছিল। সেই বছর মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচে শীল্ড পেয়েছিল। বাঙলা তথা দেশী দলের সেই সর্বপ্রথম শিল্ড পাওয়া। তারা সেণ্ট-জেভিয়ার টিম ছাড়া (এটি অমিলিটারী টিম) বাকী সব মিলিটারী দলকে হারিয়ে শেষ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল। এটা নিছক খেলার ব্যাপার। কিন্তু খবরের কাগজের অঙ্কে ও কি লিখেছে। 'এতদিনে পলাশীর প্রতিশোধ নেওয়া হল।' মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের ফটো ছাপিয়ে 'অমর এগারোজন' আখ্যায় ভূষিত করে বিক্রী হতে লাগল। মোহনবাগানের সেণ্টার হাফ-ব্যাক রাজেন সেন ছিল 'অনুশীলন'-এর সভ্য। এতে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় ঐ উক্তিটি 'পলাশীর প্রতিশোধ', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নয়। মোহনবাগানের জয় যেন পলাশীক্ষেত্রে মোহন-লালের রঙরাঙা বিজয়।"

উত্তাল কলকাতা যখন মোহনবাগানের জয়ের মধ্যে দিয়ে পলাশীর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেবার গর্বে আত্মহারা, তখন সরলা দেবী পাঞ্জাবে। সুদূর পাঞ্জাবে বসে তিনিও নিশ্চয়ই ভোগ করেছিলেন গর্বের ভাগ। আপন আত্মকথায় লিখেছেন—"মোহনবাগান যে বছর গোরাদের বিরুদ্ধে ফুটবলে প্রথম জিতলে, সে বছর তিনি (স্টেটসম্যানের ভূতপূর্ব এডিটর র‍্যাটক্লিফ সাহেব) বিলাতে ও আমি পাঞ্জাবে। "ম্যাঞ্চেস্টার গারডিয়ান"-এর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত

তখন তিনি। গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের অভূতপূর্ব জিতের খবরটা "ম্যাঞ্চেস্টার গারডিয়ানে" দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশী আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন—সরলা দেবী—বাঙলার এক নন্দিনী।"

সে কথা মিথ্যে নয়। পলাশীর পরাজয়ের ব্যথা তাঁর বুকে চিতার আগুনের মতো জ্বলতো বলেই তো তিনি সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে মাথায় করে বয়ে এনেছিলেন বীরাষ্টমীর ব্রত। বাংলার প্রত্যেকটি ছেলেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বীরবাহু। নিজের হাতে লিখেছিলেন—বীরাষ্টমীর গান।

স্বদেশানুরাগে যে জন জাগে
অতি মহাপাপী হোক না কেন,
তবুও সেজন অতি মহাজন
সার্থক জনম তাহার জেনো।
দেশহিতব্রত এ পরশমণি,
পরশিবে যারে বারেক যখনি
রাজভয় আর কারাভয় তার
ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।

সুতরাং মোহনবাগানের জয় তো তাঁরই আজন্ম সাধনারই একটা জয়চিহ্ন।